APRIL 2022

# Monthly Bulletin

VOLUME LI, NO. 4

Dr. S.B.Chakrabarti, General Secretary of The Asiatic Society felicitating Shri G. Kishan Reddy, Hon'ble Minister of Culture, Government of India. Ms. Lily Pandeya, Joint Secretary, Ministry of Culture, Government of India was also present on the occasion.

THE ASIATIC SOCIETY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

# Contents


*From the Desk of the General Secretary* 1

*Meeting Notice* 3

*Paper to be read*

- লোকসঙ্গীত ও সমাজজীবন 4
  কঙ্কণ ভট্টাচার্য

*Election Notification* 5

*In Memoriam*

- A Tribute to Professor D. P. Chattopadhyaya 12
  **Amita Chatterjee**
- Remembering Professor Dipakranjan Das 15
  **Rajat Sanyal**
- A Scholar who imbibed Rabindranath in the core of his heart and life : Somendranath Bandyopadhyay 17
  **Tapati Mukherjee**

*President's Column*

- Pandemic is off, but the Mother Earth is Grievously Ill 18

*Events*

- Observance of National Science Day with an Exhibition on Correspondences of Eminent Indian Scientists 22
- Eminent Scientists associated with The Asiatic Society 23
- International Seminar on Syamadas Chatterjee: A physicist of many splendours 25
- Seminar-Exhibition on the Handloom Industry of Bengal: Its Past, Present and Future—A Report 29
- এশিয়াটিক সোসাইটিতে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপন 33
- বইমেলায় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৩টি নতুন বই 34
- Souvenir items displayed and sold at International Kolkata Book Fair 2022 35
- Exhibition of Artwork by Children and Adults with Autism at the International Book Fair, 2022 36
  **Mitu De**

*Heritage Matters*

- Sun God Image, Nasigram, Purba Bardhaman 39
  **Rangan Kanti Jana**

*স্মরণে মননে গানের ভুবন*

- On the Musical Modes of the Hindus 41
  **Sir William Jones**
- শিল্পীর তুলিতে দুই কিংবদন্তি 42
  স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়
- আধুনিক সঙ্গীতের মননে বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ 44
  শঙ্খ সান্যাল, অর্চি ব্যানার্জি ও দীপক ঘোষ
- গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি 52
  তপতী মুখোপাধ্যায়
- না, যেও না 57
  শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
- 'লতা গীতকোষ' : নেপথ্য ইতিহাস 59
  চিত্রা সরকার
- গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় 64
  শঙ্কর কুমার নাথ
- সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান 67
  দেবপ্রসাদ দাস
- সংগ্রামী সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 70
  শান্তনু বসু
- সব্যসাচী সংগীত ব্যক্তিত্ব বাপি লাহিড়ী 77
  সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত
- স্মৃতিটুকু থাক 80
  শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
- দরদী-মরমী, জনগণবন্দিত সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 83
  কাঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়
- বর্ণময় ধনঞ্জয় 89
  স্বপন সোম
- আমার গানজীবন 93
  আরতি বসাক
- আধুনিক বাংলা গানে সমাজচেতনা ঃ কিছু কথা 96
  অভীক চট্টোপাধ্যায়
- গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায় 102
  সত্যজিৎ দাসগুপ্ত

*Music Therapy*

- Music: A Reliable Cotherapist 106
  **Chandana Aditya**
- Dance Movement Therapy 110
  **Arunima Dutta**

*Space for Research Fellows*

- বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সংগীতের ব্যবহার 112
  তনয়া আফরোজ

*Books from Reader's Choice*

- জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, *জলছবির রঙ* 115
  সুরঞ্জনা চৌধুরী

*Bibliography*

- Manuscripts on *Samgītaśāstra* in Museum Collection of the Asiatic Society, Kolkata 118
  **Keka Adhikari Banerjee**

*Books Accessioned during the Last Month* 121

# From the Desk of the General Secretary

**Dear Members and Well-wishers,**

I am pleased to announce that the Monthly Bulletin of this month will be coincidental with the completion of tenure of the present Council. On the second of May the new Council will take over for the period (2022-2024) after being elected on twenty-third April as per the election schedule declared by the duly constituted Election Committee.

Looking back, during our tenure between 2020-2022, the Monthly Bulletin of the Asiatic Society, Kolkata unquestionably marked its academic presence with stimulating intellectual input, culled from within and without, by way of disseminating thickly packed information covering a wide range of themes – both classical and modern. We have received deep appreciations from our members as well as other regular readers bearing different credentials from all over the globe.

With the return of near normalcy after a protracted COVID-19 hang over, the Society started many academic activities like seminar, workshop, exhibition, endowment lecture in physical, hybrid and other modes based on available technology. The remaining programmes during the close of this financial year included an international seminar on Professor Syamadas Chatterjee on"Syamadas Chatterjee: A Physicist of Many Splendours" (15.03.2022), a national seminar cum exhibition on "The Handloom Industry of Bengal: its Past, Present and Future" (23-24 March, 2022). Two seminars on Northeast India – one on "Evolving State of Arunachal Pradesh: Contemporary Social Science Research in a Tribal State of Northeast India" (25-26 March, 2022) and the other on "Northeast Beyond Violence: Looking Ahead" (30.03.2022).

The most remarkable achievement of the Society has been reflected through its release of thirteen books during the International Kolkata Book Fair (28.02.2022 – 13.03.2022), whch is by any standard unparallel in the history of the Society in recent times. A number of very distinguished scholars, academicians and researchers took part in the book release programmes and also visited the exhibition on the occasion of Bicentenary of Dr. Rajendralala Mitra, 125th Birth Anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose and Azadi Ka Amrit Mahotsav (Seventy Five Years of India's Independence). Thousands of visitors visited our book stall and exhibition stall which also accommodated a corner for the autistic children who drew some portraits of our freedom fighters everyday.

Friends, if you remember our Monthly Bulletin of the opening month during the present tenure of the Council was marked by a theme on CORONA which almost gripped us in almost all areas of our lives – social, economic, cultural, and what not. But we are ending up with a reflective theme i.e. Music, which keeps people happy at least for some moments in the midst of otherwise negatively impacted

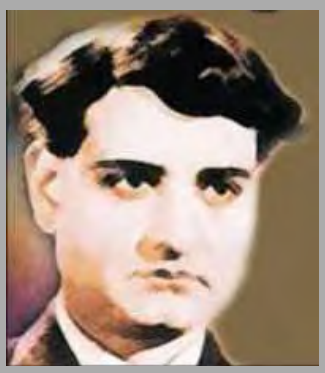

K. L. Saigal (1904-1947)

Saigal's first and best ever Tagore song Ami Tomay Jato (1939) is available at the following link:

https://www.youtube.com/watch?v=8CD88Q60E2Y

pressures of living. Let me remember that our Founder, Sir William Jones, in spite of his many academic engagements devoted time to write a valuable paper on this subject also. On this occasion we remember, specially in this month of April, Pandit Ravisankar (born on 7.4.1920) and Kundanlal Saigal (born on 11.4.1904). The former, originally named Rabindra Sankar Chowdhury, a Bharat Ratna of 1999, endeared himself before the world as a cultural ambassador of India through popularising the Sitar and Indian classical music. The latter, emerged from a modest Punjabi Hindu family, popularly known as K.L. Saigal, rose to an eminent height both as a singer as well as an actor in Bengali, Hindi films of yester year. It is said that Rabidranath Tagore gave his permission for recording of Tagore song for the first time to this non-Bengali singer. Among others he will be ever-remembered for his dual role of acting and singing in the films Tansen, Suradas, Devdas and so on.

I close my desk with a happy note of being able to project the Society to an increasing attainment of the goal targeted initially for the current phase. Hope, constant cooperation from you all will help raise it still to a higher plane in the months and years to come.

Please keep well and safe.

(S. B. Chakrabarti)
General Secretary

## সুরবন্দনা

১৯৭৪-এ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একটি গান লেখেন ও সুর করেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এটি জর্জ হ্যারিসন প্রযোজিত *শঙ্কর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস* অ্যালবামটির প্রধান গান। কণ্ঠ দিয়েছিলেন লক্ষ্মী শঙ্কর, গিটারে ছিলেন জর্জ নিজে। ৪৮ বছর পর, রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে রবিশঙ্করের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শিল্পীর স্ত্রী সুকন্যা শঙ্করের সঙ্গে সেই গানটি আবার গাইলেন জর্জের ছেলে ধানি হ্যারিসন। এই অনুষ্ঠানটি ২০২০-তে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে পিছিয়ে যায়। দু'বছর পর, অনুষ্কা শঙ্করের নেতৃত্বে বন্ধু, পরিবার এবং শিষ্যেরা মিলে শিল্পীর জনপ্রিয় সৃষ্টিগুলি গেয়ে ও বাজিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। তন্ময় বসু এবং বিক্রম ঘোষের বাজনা দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করল। রবিশঙ্করের সুরে হিন্দি ছবি *অনুরাধা*-তে গান গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হল তাঁকেও। সুকন্যা জানালেন, পণ্ডিতজির অসুস্থতার সময় লতা তাঁকে ফোন করতেন, প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলতেন তাঁরা। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্যগোষ্ঠীর ১০০ জন শিল্পীর মোমবাতি হাতে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কনসার্টটি শেষ হল। সাউথ ব্যাঙ্ক

■ **স্মৃতি:** রবিশঙ্করকে নিয়ে প্রদর্শনী থেকে শিল্পী ও তাঁর 'কানাইলাল' সেতারের ছবি

সেন্টারে শিল্পীর জীবনীকার অলিভার ক্রাস্কের তত্ত্বাবধানে চলছে শতবার্ষিকী প্রদর্শনী। ছবি ও ভিডিয়োয় ধরা পড়েছে শিল্পীর জীবনের নানা মুহূর্ত। শৈশবে দাদা উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ, ইহুদি মেনুহিনের সঙ্গে কাজ, স্ত্রীর সম্মানে সৃষ্টি করা শেষ অপেরা 'সুকন্যা'। রয়েছে শিল্পীকে লেখা জর্জ হ্যারিসনের চিঠি, তাতে তাঁর সেতার অনুশীলনের সময় ধৈর্য ধরে থাকার জন্য শিল্পীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জর্জ। প্রথম বার দেখা যাচ্ছে ১৯৪৪-এ কলকাতার কানাইলালের দোকান থেকে কেনা শিল্পীর বিখ্যাত সেতারটি।

সৌজন্য: আনন্দবাজার পত্রিকা

# AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 4TH APRIL 2022 AT 5 P.M. AT THE VIDYASAGAR HALL OF THE SOCIETY

**MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING**

## AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 7th March, 2022.
2. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
3. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
4. Consideration of reports and communications from the Council as per Regulation 49(g).
5. The following paper will be read by Shri Kankan Bhattacharya:
   *Loksangit O Samajjiban*

Dated : 24.03.2022

(S B Chakrabarti)
General Secretary

***COVID-19 Safety Protocol will be strictly adhered to***

# লোকসঙ্গীত ও সমাজজীবন

**কঙ্কণ ভট্টাচার্য**
লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক ও গায়ক

**সারাংশ**

সুদূর আদিম সময়ে নানা শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে মানুষের কণ্ঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি নির্গত হয়েছিল। এইসব ধ্বনিতে কণ্ঠের ওঠানামার লক্ষণ ছিল। এগুলিই সঙ্গীতের প্রাথমিক উপাদান। পরবর্তীকালে জন্ম নেওয়া নানা লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই শ্রম-শব্দগুলি থেকে তিন চার পর্দার আঞ্চলিক গান জন্ম নেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এর চেহারা ছিল ভিন্নতর। এইসব গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাইতেন সমাজের নিম্নবর্গের শ্রমজীবী কৃষি সম্প্রদায়।

ভারতে আর্য আগমনের পর তাদের সঙ্গীতগুণীরা আঞ্চলিক গানগুলিকে আয়ত্ত করে তার সঙ্গে দু'এক স্বর যুক্ত করে তাকে রাগ-এ উন্নীত করেন। এভাবে আঞ্চলিক গানের প্রাণ বহন করে পাঁচ ছয় সাত স্বরের অজস্র রাগ-রাগিণীর জন্ম হয়। তার স্বাক্ষর আজও রাগ-রাগিণীগুলি বহন করছে। এইসব গান সমাজের উচ্চবর্গের গান হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অপরদিকে পরিবর্তনশীল শ্রম সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত থেকে, তার অগ্রগতির ধারা বহন করেই আঞ্চলিক গানগুলিও ক্রমে পাঁচ ছয় সাত স্বরের সুরে পরিণত হয়। মূলত মুখে মুখে তার প্রচার ও প্রসার। সমাজের নিচুতলার শ্রমজীবী কৃষিজীবী ও কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের আনন্দদানের মূল উপকরণ হিসাবেই তার সার্থকতা। তার বর্তমান রূপকেই আমরা লোকসঙ্গীত বলে মানি।

এ গান আজও একান্তভাবে আঞ্চলিক। এলাকাভেদে তার এক এক রূপ। এই বাংলার মূল লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, বাউল, আদিবাসী গান এবং অসংখ্য লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত ভাদু, টুসু, করম, ডাঙ্গালের গান এবং নানা শ্রমসঙ্গীত সে কথাই বলে।

সময়ের সঙ্গে এরা সবাই নিত্য পরিবর্তিত হয়ে সমাজকে প্রতিফলিত করছে। তাই লোকসঙ্গীত আসলে এক চলমান ইতিহাস।

# Election of Office-bearers and other Members of the Council of The Asiatic Society, Kolkata for the period 2022- 2024.

## Attention: All Members

The Election Committee of The Asiatic Society, Kolkata, invites your kind attention to the following in connection with the election of Office-bearers and other Members of the Council for the period 2022- 2024, which is scheduled to be held on **23rd April 2022 (Saturday) during 10:00 a.m. to 5:00 p.m.** at the premises of the Asiatic Society at 1, Park Street, Kolkata 700016.

1. 'List of contesting candidates' and 'List of candidates elected uncontested' have been published in the April, 2022 issue of the Monthly Bulletin of the Society and are also on display in the Office Notice Board and in the website (www.asiaticsocietykolkata.org) of The Asiatic Society.
2. Rules framed by the Election Committee for conduct of election are on display in the Office Notice Board and in the website (www.asiaticsocietykolkata.org) of The Asiatic Society.
3. Only those members whose names have been included in the final list of voters published on 4th March, 2022 and are not appointed to any office in the Society to which a salary or emolument is attached, can cast their votes in the election to be held on 23rd April 2022 (Saturday).
4. Final Lists of the voters (both Life Members & Ordinary Members) have already been displayed in the website of the Society (www.asiaticsocietykolkata.org).
5. Model Ballot paper (front-side) with instructions for voters has been kept on display in the Office Notice Board of The Asiatic Society.
6. Instructions to be followed by the voters at the time of casting their votes:
    a) Use √ mark to cast your vote in the box provided against name/s of Candidate/s.
    b) Number of box ticked must not exceed the number of available seat for the position (i.e. 4).
    c) Please use the pen provided inside the voting chamber for marking on the ballot paper.

d) Please put only √ mark and no other mark to cast your vote. Please ensure that the ballot paper, after casting your vote, is put in the right ballot box provided for the position.

e) Failure to comply with above instructions will lead to rejection of ballot paper at the time of counting.

**7. There will be one ballot paper for the position of Members of the Council (four seats) to be contested and each voter may cast his/ her vote minimum one and maximum four.**

8. There will be sufficient number of identification counters for the members at the Ground Floor of the Asiatic Society Building at 1, Park Street , Kolkata -700016.

9. Nobody except the valid voters, contesting candidates, employees of the Society on election duty and polling agents and election agents of the contesting candidates will be allowed inside the polling hall.

10. Any kind of campaigning will not be allowed inside the polling hall.

11. At 05:00 p.m. on the day of the election (i.e. 23rd April, 2022), all the gates of the polling hall will be closed for entry and only those members who have already entered the premises may cast their votes (if not already cast).

12. Counting of votes will take place on 23rd April, 2022 (Saturday) in the premises of The Asiatic Society, Kolkata from 6:00 p.m. onwards.

**13. All members are requested to carry their Membership Card, where available, along with one of the alternative Photo Identity documents as specified by the Election Commission of India on the day of the election ( i.e. 23rd April, 2022) as proof of identity.**

14. Shri Arupratan Bagchi, Administrative Officer of the Society will function independently on behalf of the Election Committee and in liaison with the members of the Election Committee for smooth conducting of the said election process and report to the Election Committee accordingly from time to time during the election process in the interest of free and fair election of the Society.

**15. All are requested to strictly comply with the COVID-19 safety protocols.**

The Asiatic Society, Kolkata
Dated: 23rd March, 2022

Prepared and circulated by the
Election Committee of
The Asiatic Society, Kolkata

# The Asiatic Society, Kolkata

**Ref No : TASK/Elec-2022/2021-22/122** **Dated :23.03.2022**

## Election of the Office-bearers and other Members of the Council of The Asiatic Society, Kolkata for the period 2022-24

### *Declaration of Election*

### *When position (seat) is uncontested*

*In pursuance of the provisions contained in the rules framed by the Election Committee (under Amended regulation 37 (b) of The Asiatic Society Act,1984, we , the Election Committee declare that the following candidates have been duly elected, uncontested to the Council of The Asiatic Society, Kolkata for the period 2022 – 2024 in the respective positions (seat) as mentioned below:*

| Sl No | Position [Seat] | Name of the elected Candidates, Address and Membership No |
|---|---|---|
| 1 | President [One Seat] | Swapan Kumar Pramanick<br>47, Himangshu Chakraborty Road, Kolkata 700035<br>Membership No P00021 |
| 2 | Vice President [Four Seats] | i] Subhas Ranjan Chakraborty<br>BB45, Flat No. 1, Salt Lake City,<br>Kolkata 700064<br>Membership No C00048 |
| | | ii] Basudeb Barman<br>AA115 Sector I, Salt Lake City,<br>Kolkata 700064<br>Membership No B00263 |
| | | iii] Tapati Mukherjee<br>65 Hindusthan Park<br>Kolkata 700029<br>Membership No M00218 |
| | | iv] Pradip Bhattacharya<br>59 Palm Avenue, Flat 4, Kolkata 700019<br>Membership No B00222 |
| 3 | General Secretary [One Seat] | Satyabrata Chakrabarty<br>15/8 Raj Krishna Pal Lane, Kolkata 700075<br>Membership No C00188 |
| 4 | Treasurer [One Seat] | Sujit Kumar Das<br>68A, Beckbagan Road , Kolkata 700017<br>Memebership No D00090 |
| 5 | Anthropological Secretary [One Seat] | Ranjana Ray<br>49/53 Prince Gulam Md. Saha Road<br>Kolkata- 700033<br>Membership No R00053 |

| Sl No | Position [Seat] | Name of the elected Candidates, Address and Membership No |
|---|---|---|
| 6 | Biological Science Secretary [One Seat] | Asok Kanti Sanyal<br>66 Dum Dum Road, Ahana Apartment Flat IC<br>Kolkata<br>Membership No S00277 |
| 7 | Historical and Archaeological Secretary [One Seat] | Arun Kumar Bandopadhyay<br>Krishnachura, 26A/1B Jhil Road,<br>Flat 3A,(Second Floor) Kolkata 700031<br>Membership No B00433 |
| 8 | Library Secretary [One Seat] | Biplab Chakrabarti<br>Aditi -4, 466 Garfa Main Road, Kolkata -700075<br>Membership No C00193 |
| 9 | Medical Science Secretary [One Seat] | Sankar Kumar Nath<br>11, Durga Charan Doctor Road, Kolkata 700014<br>Membership No N00041 |
| 10 | Publication Secretary [One Seat] | Syamal Chakrabarti<br>2B Khasmahal Street<br>Kolkata 700006<br>Membership No C00267 |
| 11 | Physical Science Secretary [One Seat] | Rajkumar Roychoudhury<br>1175 Survey Park, Opp. Ambuja Last Gate,<br>Chaturanga, Kolkata 700075<br>Membership No R00101 |
| 12 | Philological Secretary [One Seat] | Shyam Sundar Bhattacharya<br>27A/1 Bhuban Mohan Roy Road<br>Kolkata 700008<br>Membership No B00333 |
| 13 | Jt. Philological Secretary [One Seat] | M. Firoze<br>9, A.K.M. Siddique Lane(Formerly Wellesly Second)<br>Kolkata 700016<br>Membership No F00001 |

Sd/-

**Shri Biswanath Chakraborty, WBCS(Exe.),**
*Director of Industries- in-charge*
*Dept. of Industry, Commerce and Enterprises,*
*Govt of West Bengal*
*Member of the Election Committee*

Sd/

**Prof. Jayasri Ray Chaudhuri**
*Director of Public Instruction*
*Dept. of Higher Education*
*Govt of West Bengal*
*Member of the Election Committee*

Sd/-

**Prof. Jayanta Sengupta**
*Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall*
*Chairman of the Election Committee*

Date : 23rd March, 2022
Place : Kolkata

# The Asiatic Society, Kolkata

**Ref No : TASK/Elec-2022/2021-22/123** **Dated :23.03.2022**

## Election of the Office-bearers and other Members of the Council of The Asiatic Society, Kolkata for the period 2022-24

***List of Contesting Candidates***
***Position wise Seat(s) with name of the candidates in alphabetical order.***

***Position : Members of the Council*** ***Seat : Four [04]***

| Sl No | Name | Address | Membership No |
|---|---|---|---|
| 1 | Arunabha Misra | 167 Nakari Mondal Road, Kanchrapara 24 Paraganas (N), Pin 743145 | Membership No M00223 |
| 2 | Atis Kumar Dasgupta | Flat B3, Estate B, VIP Road, Kolkata-700054 | Membership No D00061 |
| 3 | Dr. Bishnupada Dutta | 23/1B , Doctor Lane, Kolkata 700014 | Membership No D00122 |
| 4 | Mahidas Bhattacharya | 62/4, Kendua Main Road (Ground Floor), Kolkata 700084 | Membership No B00552 |
| 5 | Nabanarayan Bandopadhyay | Kabi Sukanta Co-operative Housing Society, P-19B CIT Scheme, Kolkata 700007 | Membership No B00075 |
| 6 | Rangan Kanti Jana | 3B/Block B/3rd Floor, BHP II, Sripally, Burdwan-713103 | Membership No J00023 |

Sd/-

**Shri Biswanath Chakraborty, WBCS(Exe.),**
*Director of Industries- in-charge*
*Dept. of Industry, Commerce and Enterprises,*
*Govt of West Bengal*
*Member of the Election Committee*

Sd/

**Prof. Jayasri Ray Chaudhuri**
*Director of Public Instruction*
*Dept. of Higher Education*
*Govt of West Bengal*
*Member of the Election Committee*

Sd/-

**Prof. Jayanta Sengupta**
*Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall*
*Chairman of the Election Committee*

Date : 23rd March, 2022
Place : Kolkata

# THE ASIATIC SOCIETY, KOLKATA

**1 PARK STREET, KOLKATA -700016**

## Council Election 2022-24

## Attention: All Members

1. An election of the Office-bearers and other Members of the Council of the Asiatic Society, Kolkata for 2022-24 is to be held on 23.04.2022 (Saturday) at the premises of the Asiatic Society, Kolkata at 1 Park Street, Kolkata -700016 from 10:00 hrs. to 17:00 hrs.

2. Final List of Voters in connection with the said election has been published and is available in the Administration Section of the Society at 1 Park Street, Kolkata -700016. It is also displayed on the Society's Website (www.asiaticsocietykolkata.org). Only validly nominated candidates are eligible to get set of Electoral Roll on payment of Rs.500/- per set.

3. Rules framed by the Election Committee for conduct of election are also displayed in the Office Notice Board of The Asiatic Society and on the Society's Website (www.asiaticsocietykolkata.org).

4. Nomination Forms will be available from Shri Arupratan Bagchi, Administrative Officer of the Society at Humayun Kabir Hall on all working days including Saturday from 09.03.2022 (Wednesday) to 17.03.2022 (Thursday) between 12:00 hrs and 15:00 hrs. The last date of the submission of Nomination Form is 17.03.2022 (Thursday) up to 15:00 hrs.

5. Only those members whose names have been included in the Final List of Voters and are not appointed to any office in the Society to which a salary or emolument is attached, can participate in the election process.

Published by the Election Committee

The Asiatic Society, Kolkata

# The Asiatic Society

Founded in 1784

*(An Institution of National Importance declared by an Act of Parliament)*
*and*
*(An Autonomous Organization under Ministry of Culture, Government of India)*

**Patron : Hon'ble Governor of West Bengal**

Ref. No. : TASK/Elec-2022/2021-22/114 Date : 07/03/2022

## Notice of Election

*[Regulation 27 (c) (ii) (amended)]*

Notice is hereby given that:

(1) An election is to be held of the Office -bearers and other Members of the Council of the Asiatic Society, Kolkata for 2022-24 for each of the following positions (seats) :

| | |
|---|---|
| (i) | President [One Seat] |
| (ii) | Vice-President [Four Seats] |
| (iii) | General Secretary [One Seat] |
| (iv) | Treasurer [One seat] |
| (v) | Library Secretary [One Seat] |
| (vi) | Publication Secretary [One Seat] |
| (vii) | Philological Secretary [One Seat] |
| (viii) | Biological Science Secretary [One Seat] |
| (ix) | Physical Science Secretary [One Seat] |
| (x) | Medical Science Secretary [One Seat] |
| (xi) | Historical & Archaeological Secretary [One Seat] |
| (xii) | Anthropological Secretary [One Seat] |
| (xiii) | Joint Philological Secretary [One Seat] |
| (xiv) | Council Members [Four Seats] |

(2) Nomination Forms will be available from Shri Anupratan Bagchi Administrative Officer of the Asiatic Society and the Authorized Person of the Election Committee at Humayun Kabir Hall of the Society at 1Park Street, Kolkata -700016 on all working days (including Saturday) from **09.03.2022 (Wednesday)** to **17.03.2022 (Thursday)** between **12:00 hrs** and **15:00 hrs**. and may be submitted by the candidate or his/her proposer to the authorized person of the Election Committee (Administrative Officer) at the abovementioned place on any working day (including Saturday) between **12:00 hrs and 15:00 hrs** not later than **17.03.2022 (up to 15:00 hrs)**.

(3) The Nomination forms received by the office of the Asiatic Society will be taken up for scrutiny at Humayun Kabir Hall of the Society at 1 Park Street, Kolkata -700016 on **21.03.2022 ( Monday)** at **15:00 hrs**. The list of validly nominated candidates will be published in the Office Notice Board of the Society on **21.03.2022 (Monday) after 15:00 hrs.**

(4) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his/her Election Agent to the officer specified in paragraph (2) above at the Humayun Kabir Hall of the Society **before 15:00 hrs of 23.03.2022 (Wednesday).**

(5) The final list of contesting candidates will be published in the Office Notice Board and also displayed on the website of the Society on **23.03.2022 (Wednesday) after 15:00 hrs**.

(6) In the event of the election being contested, polling will take place on **23.04.2022 (Saturday)** at the premises of the Asiatic Society, Kolkata at 1 Park Street, Kolkata -700016 **from 10:00 hrs. to 17:00 hrs**.

(7) In the event of the election being contested and polling of votes done, counting of votes will commence on **23.04.2022 (Saturday) from 18:00 hrs. onwards** at the premises of the Asiatic Society, Kolkata at 1 Park Street, Kolkata -700016

THE ASIATIC SOCIETY COUNCIL ELECTION 2022-24 KOLKATA

Chairman, Election Committee
The Asiatic Society, Kolkata

Date : 7th March, 2022
Place : Kolkata

1 Park Street | Kolkata-700016 | Phone : 2229-0779, 2249-7250, 2229-7251 | (D) 2229-3993 Fax : 91-033-2217-2355
website : www.asiaticsocietycal.com | e-mail : gs.asiatic@gmail.com / theasiaticsociety@gmail.com

# A Tribute to Professor D. P. Chattopadhyaya

**Amita Chatterjee**
Emeritus Professor, Jadavpur University

Professor Debi Prasad Chattopadhyaya, 89, passed away in his Kolkata residence on 13 February 2022. Like the Second President of India, Sarvepalli Radhakrishnan, Chattopadhyaya was a Philosopher-Statesman, who served as former Union Minister of Commerce and Deputy Minister for Health in the Union Cabinet of Mrs. Indira Gandhi in the 1970s, as Member of Rajyasabha for two terms, an MLA of West Bengal and Governor of Rajasthan (1990-91). An outstanding scholar of History and Philosophy of Science, Society and Culture of our time, he was a dedicated teacher, a prolific author, a natural leader, an astute and accomplished politician, a visionary administrator, a connoisseur of art and music, and above all, a compassionate and caring person with charming manners and a mesmerising presence.

1933-2022

Chattopadhyaya studied Law, History and Philosophy in Calcutta University and obtained two Ph.D. degrees, first from Calcutta University and then from London School of Economics in two unrelated subjects. He taught philosophy at Jadavpur University till his retirement. Banaras Hindu University conferred on him a D. Litt. degree Honoris Causa. He was National Distinguished Professor in many universities in India and taught and researched at different universities in Asia, Europe and USA between 1954 and 1994. He was the founder Chairman (1981-1990) of the Indian Council of Philosophical Research, Chairman of Indian Institute of Advanced Study, Shimla, founder Chairman of Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata, Member of International Institute of Philosophy, Paris, Life-Member of Russian Academy of Sciences and Chairman of Indian Philosophical Congress (2000-2009). Chattopadhyaya received Padma Vibhushan in 2009 for his work as a scholar, teacher and institution builder. Indian Council of Philosophical Research bestowed on him Life-Time Achievement Award (2010-11).

Professor Chattopadhyaya left his indelible marks wherever he worked. He believed in leading from the front and not only through precepts. He was closely associated with Jadavpur University Teacher's Association

(JUTA) and took part in many significant negotiations with students as well as with the Government. His recommendations on training, promotion and benefits of teachers at all levels in the report of Chattopadhyaya Commission (1983-85) on Education are still relevant in the Indian context. According to the late Pranab Mukherjee, he was the only Commerce Minister of Independent India who could deliver an export surplus in 1976. According to his own admission, his greatest achievement in life was to introduce the Medical Termination of Pregnancy Bill in Parliament as Deputy Minister of Health and got it passed in 1971. He was happy because he could be a part of the emancipation of women by legalising abortion.

Chattopadhyaya was a voracious but discerning reader. Even when he was at the helm of Ministry of Commerce and Industries, he managed to set aside six hours a day for his studies and thus kept himself abreast of the latest developments in his fields of specialisations. A superb syncretist, he delighted in drawing on thinkers propounding opposing tenets. It was therefore no surprise that he chose philosophies of Karl Marx and of Sri Aurobindo as the topic of his first Ph.D. thesis and of a later publication. Deeply immersed in different traditions and cultures, Chattopadhyaya was one of the early propounders of multi-disciplinary and inter-disciplinary studies in India. He authored and edited a large number of books and anthologies, published around 300 research papers in various journals, contributed to different anthologies and encyclopaedias. Some of his significant publications include *Individuals and Societies* (1967), *Individuals and Worlds* (1976), *Sri Aurobindo and Karl Marx* (1988), *Anthropology and Historiography of Science* (1990), *Induction, Probability and Scepticism* (1991), *Inter-disciplinary Studies in Science, Technology, Philosophy and Culture* (1996) *Sociology, Ideology and Utopia* (1997), *Society, Cultures and Ideologies* (2000), *Ways of Understanding the Human Past* (2001), *Science, Society Value and Civilizational Dialogue* (2002), *Roop, Rosh O Sundar: Nandantatter Bhoomika*, revised edition (2008). On the occasion of his sixty-fifth birthday, a festschrift volume entitled *History, Culture and Truth* was presented to him. The volume edited by Daya Krishna and K. Satchidananda Murty comprised twenty two essays centering around Chattopadhyaya's thoughts and works by eminent scholars from India and abroad. These essays dealt with issues ranging from philosophy to science, history, culture, social and political studies which engaged Chattopadhyaya's attention throughout his intellectual life.

As founder-chairman of Indian Council of Philosophical Research Chattopadhyaya rejuvenated research and teaching in philosophy, created opportunities for practising philosophers and academics through foreign and Indian collaborations both at governmental and non-governmental levels. He brought into lime-light the works of traditional Sanskrit scholars, encouraged continuing dialogues between the torch-bearers of Indian cultural traditions and modern western scholars. Being inspired by Joseph Needham's large project on Science and Civilization in China, Chattopadhyaya founded the Centre for Studies in Civilizations and conceived a large-scale project, viz., 'Project of History of Indian Science, Philosophy and Civilization' (PHISPC) funded by the Ministry of Human Resource Development together with a sub-project on Consciousness, Science, Society, Values and Yoga (CONSSAVY) approved by the Department of Education. The declared goal of the Project was to conduct, promote and facilitate studies and research in the broad areas of history, philosophy, culture, science and technology in relation to the past, the present and the future courses, contents and trends of civilizations in general and Indian civilization in particular. Initially the plan was to publish fifty volumes of books, anthologies and monographs

under the supervision of leading scholars and after in-depth research on our traditions. However, the project eventually led to the publication of 120 well-researched volumes. Chattopadhyaya also edited *Sandhan,* the Journal of the Centre for Studies in Civilizations, New Delhi.

A staunch believer in cultural pluralism of a catholic variety, Chattopadhyay highlighted the organic relationship amongst all human endeavours and achievements, and continuity between the natural, biological and cultural on one hand and between the physical and spiritual framework of our life-world on the other. He always attempted to unveil the nature of linkages between science, technology, philosophy and culture. He has argued in several of his works in favour of the thesis that "philosophy, science, technology and culture are, in fact, an interwoven fabric of human civilization and that their speciation, differentiation or compartmentalization is due mainly to theoretical needs for specialization. Rightly understood, even these theoretical needs have their unmistakable practical underpinnings. All branches of knowledge, rightly viewed, are complementary quests for and enlargement of human freedom." (Chattopadhyaya, 1996, 292-3) He had a holistic vision of human civilization and maintained, "we are all scientists in a sense, make use of technology, are accultured in some way or other, and stand committed to some or other world-view or philosophy...History is an integral part of humanity... We are all engaged in some or other economic pursuit... Our body-mind complex, open to information flow, is always more or less environmentally informed." (*Ibid*.) In short, humans are all situated beings, free enough to critically review and creatively re-enact their past, re-write the events they have faced in the light of new evidence, new ideas and reasoning. The future of human knowledge, therefore, remains open-ended forever.

Professor D.P. Chattopadhyaya has left for us a rich legacy of ideas and ideals. The huge treasure-trove of his philosophical writings are yet to be explored in full and evaluated properly. Maybe, his dominant public image stood in the way of right assessment of Chattopadhyaya the Philosopher during his life-time. I sincerely hope that younger scholars would come forward to review his philosophical contributions by way of discharging their Rishi-ṛṇa.

# Remembering Professor Dipakranjan Das

**Rajat Sanyal**
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Calcutta

Dipakranjan Das, more popular in the academic domain as D.R. Das, was born in the modest western Bengal township of Rampurhat in the Birbhum district, later settling at Chinsurah in the Hooghly district. After earning the Master of Arts with first class in Ancient Indian History and Culture (AIHC) from the University of Calcutta in 1960, Das began his research on economic history under Prof. D.C. Sircar, the doyen of South Asian epigraphy, to obtain a Ph.D. in 1966. After a short teaching tenure in the erstwhile Sanskrit College, he joined the AIHC Department as Lecturer in 1970. His first monograph carrying the title of his doctoral dissertation came out in 1969 (*Economic History of the Deccan*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1969). However, Das had completely shifted his focus to the study of early Indian architectural tradition, by the time he joined University teaching—a focus that not only brought him international recognition in the decades to come, but also the one from which he never deviated in the fifty years of his academic life as an art historian.

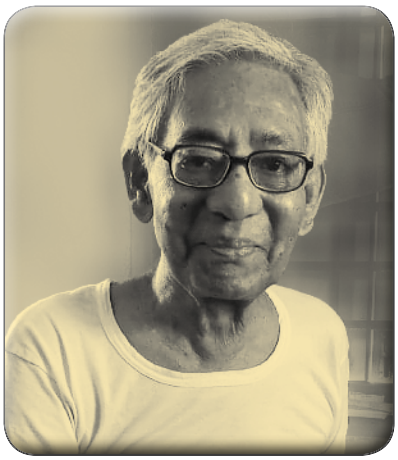

1939-2021

Being a direct student of S.K. Saraswati, one of the pioneering art historians of India, early works of Das fairly display the impact of Saraswati's methodological approach with precise focus on stylistic details for setting chronology of the shrines and imageries. However, his researches were deeply influenced by the genre envisioned by Nirmal Kumar Bose, focusing on the 'anatomy' of early medieval-medieval temples, grounded in a strong fieldwork-based empirical frame, but at the same time underlining the larger canvas of the aesthetic minds of early Indian architects. He undertook decades of painstaking fieldwork in different parts of western and northern Odisha, as well as the eastern fringes of the Chhotanagpur plateau, comprising the western districts of West Bengal and the contiguous areas of what is presently Jharkhand.

His principal research interest centred round the essentially autochthonous engineering skill of the indigenous, itinerant artist. Thus, he spent his whole life in searching for the inspiration that drove the 'anonymous' Indian artisans, going beyond the canonical prescriptions, to inscribe their identities on the monuments they erected, by way of innovative, experiential and experimental constructional skills. Concentrating on the minutiae of mathematical details of architectural engineering in understanding the comparative chronology of temples, Das brought in a real touch of science in early Indian architectural studies and successfully refined and reshaped the paradigm envisaged by Nirmal Kumar. In accomplishing his goals, in the field, he often had the company of fellow stalwarts like David J. McCutchion and Tarapada Santra. Besides temple architecture, his essays on temple imageries demonstrate his thorough grasp over iconography and stylistics of image making in early India.

Thus, by the time Das superannuated as Reader in AIHC in 2004, he had authored two more extremely important monographs, *Temples of Orissa* (Agam Kala Prakashan, 1982) and *Temples of Ranipur-Jharial* (University of Calcutta, 1990), besides about forty articles in international journals and volumes of repute. His essays in Bengali, primarily focusing on the medieval and pre-colonial history of the Hooghly-Chinsurah area, equally demonstrate the degree of his erudite scholarship as do his works in English. Das was also a noted philatelist, as manifested in some of his thematic exhibitions. After retirement, he served as a member of the West Bengal Heritage Commission. This versatile genius and an unsung hero of Indian art historical studies breathed his last in October 2021, leaving the lasting legacy of his fundamentally unique research methodology.

# A Scholar who imbibed Rabindranath in the core of his heart and life : Somendranath Bandyopadhyay

**Tapati Mukherjee**
Library Secretary, The Asiatic Society

Born in 1926, Somendranath Bandyopadhyay was a renowened Tagore scholar who started his career as a teacher in Vidyasagar College.

Kolkata.Later he taught Bangla language and literature in Visva-Bharati, Santiniketan in his formative years i.e. 1957-1991. He was closely associated with the Japanese Department of Visva-Bharati too.

1926 -2022

Apart from his fascination for Tagore's creative exuberance and multifarious activities as apostle of humanism, his ingrained faith in the Tagorean concept of universalism and mutual fraternity, free from aggressive nationalism backed by arrogant show of muscle power, inspired him to promulgate these ideas through his lectures, books and above all his simplistic lifestyle. Despite his calm and modest demeanour which endeared him to all, he had the courage and moral strength to raise his voice against any high-handedness of the authority when situation demands. Somendranath was soft but strong.

Somendranath`s erudition has been evinced in multiple books authored by him on various topics viz art, philosophy and literature. He translated Kshitimohan Sen *Hindu Dharma in Bangla*. His books include *Banglar Baul Kabya o Darshan, Rabindra Chitrakala, Rabindra Sahityer Patabhumi* (translated into Japanese), *Rabindra Bhavana Posterity-r Pathey*. His book on *Ramkinkar Baij Shilpi Ramkinkar : Alapchari* (translated into English *My days with Ramkinkar Baij* by Bhaswati Ghosh) is an excellent piece of penetrating insight into the human psyche. Another book Bismaraner Baire throws light on many interesting episodes of his life. Somendranath had the honour to present speeches and chair sessions in various national and international events.

Somendranath received several accolades in his life. He was awarded Sudha Basu Prize (1986) and Sarojini Basu Gold Medal (2004) by Calcutta University. Rabindrabharati University awarded him a D.Litt degree in 2012, followed by Assam Central University in 2013. The Asiatic Society, Kolkata honoured him with the Acharya Sukumar Sen Gold Medal in 2014. Somendranath was the recipient of the Lifetime Achievement Award, awarded by Soka University of Japan.

An erudite scholar, an ardent believer in Tagorean concept of humanism, a man with a smiling face decked with an indomitable spirit, Somendranath had etched his place in the history of Bangla literary criticism and art. True, he is no more with us in mortal form, but he will remain for ever in the hearts of countless students, colleagues and connoisseurs.

May his soul rest in peace.

President's Column

# Pandemic is off, but the Mother Earth is Grievously Ill

Worldwide, there is sigh of relief with the incidence and impact of Covid 19 systematically declining. The cost of this pandemic has been devastating. Over 60 lakhs of people have died globally due to this disease while in India the disease has cost the lives of over 5 lakhs of people. It has affected countries, rich and poor, the developed and the developing countries equally. The old and the aged are the particular victims of this dreaded disease but it does not mean that the impact of the disease has been confined to them only. The biology of SARS and its low level of transmissibility seem to be the main reason for the low risk for contagion in children. As a result, proportionately fewer children were affected. It has been estimated that 5% of all cases were diagnosed in patients below 18 years of age. But in a disease which has affected 45 crores of people worldwide during the past two years, 5% also means a huge number. But the situation is now that with the incidence of Covid 19 declining after the end of third wave, normalcy is gradually being restored.

But though the hazards of pandemic has been reduced, at least for the time being, the overall danger to what is known as planetary health continues to be in a grave situation. The human health impact of environmental change, which includes biodiversity loss, deforestation, increasing carbon emissions arising from using fossil fuels causing dangerous global warming over years and the resultant atmospheric pollution associated with recurrent drought, flood and the like over a wide part of the world – all these are happening in an unabated form. The annual $CO_2$ emissions are rising exponentially since the beginning of the era of industrialisation. The WHO has termed climate change as the single biggest health change facing humanity. Extreme heat waves are thrice in common now. One estimate shows that the number of extremely hot days worldwide – when the temperature breaches 50 degree centigrade has doubled since the 1980s. The World Economic Forum estimates 2,50,000 annual losses of life worldwide from 2030 with intensifying exposure to heat, infectious diseases and malnutrition, climate change resulting in crop failures. Another estimate shows that 10 million precious lives are lost annually due to air pollution, caused by the combustion of fossil fuels like coal and diesel. Increasing incidents of climate shocks and weather disasters are resulting in loss of life, human displacements, habitation loss and increasing incidents of trauma and mental health problems. The situation has been described as public health emergency and the crisis is much more than Covid 19. We do have to remember that our bodies come from nature and that only by healing earth, we heal ourselves.

The situation has been more dangerous

for the developing countries which are the worst victims of the environmental degradation. Like in other cases, there is a sharp North-South division in this respect. As the developed countries had industrialised themselves much earlier, they could cope with the emerging problem of environmental pollution in a more time-bound manner. But the developing countries are undergoing the process of industrialisation only lately and so their problems in tackling the rapid environmental pollution is much more.

Not that humanity has remained oblivious to this problem which has the potential to strike at the very root of civilisation. Organised endeavour to deal with the problem started 50 years back when in Stockholm, Sweden, in 1972 the first global conference on environment known as United Nations Conference on Human Environment was held. The Stockholm declaration and the Plan of Action was adopted there. Then in 1988 the Inter Governmental panel on Climate Change (IPCC) was constituted. This panel was a quasi-permanent body aiming at publishing periodical reports on the situation. These reports were placed in different conferences of the United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC). Since April 1995 till 2021, the Conference of Parties (COP) are being held almost every year. Till now altogether 26 such Conferences have been held. The primary objective of the Conference has been to assess the Green House Gas Production and to minimise it at such a level as may not further endanger the climate system. The Annual Reports submitted at the end of the conference have been instrumental in formulating policy guidelines of the member state. The latest such international meet was held at Glasgow in 2021 known as United Nations Climate Change Conference or COP 26. This was held last year between 31st October to 13th November. It has since submitted its report which we intend to analyse a little later.

Apart from these periodical international meets, a few other conferences have been held where also some international level understandings have been arrived at on the issue of climate change. These are 'Montreal Protocol' (1987), 'Kyoto Protocol' (1997) and 'Paris Agreement' (2015). The Paris Agreement was a landmark treaty in which, till 2021, 193 members have ratified. For the first time in the Paris Agreement, the members have agreed to keep the rise in mean global temperature to below 2 degree c. above the pre-industrial level. That should be the immediate goal whereas the ultimate objective was to reduce the carbon emission at the net zero level by the middle of the 21st century. This goal was set not only for the developed countries but also for the developing countries. The strategy of climate financing was adopted so that the developed countries should help the developing countries to build up infrastructure to switch over to non-conventional sources of energy which keep emission at a very low level. It is interesting to note that the U.S. withdrew from the Paris Agreement during the regime of President Trump but decided to join it after Biden was elected as President. But laudable as these promises and goals are, there was no specific strategies to reach this goal. One can say that these were toothless in nature as these were full of promises but no strategy for action implied.

The COP 26 congregation took place in such a situation. The specific objective was to specify the time limit within which the declared objective of reaching the climate target could be achieved. Reviewing its achievements at the end of the conference, it has been said that "COP 26 wraps up short of climate target but high on blame games". The two key issues before the conference were of two types : (1) specifying the time limit to arrive at the target of 1.5 degree c. and (2) to meet the logistic and infrastructural support, including the issue of climate financing, to reach the goal. There was a clear division between the developed world

and the developing world regarding how and when to reach the goal. The key issues for debate was climate finance and the possibility of a carbon market. A group of 22 countries, including India, called Like Minded Developing Countries (LMDC) protested against 'Carbon Colonization' in the context of developed nation trying to enforce a 1.5 degree c. warming

## Monthly Bulletin December 2021

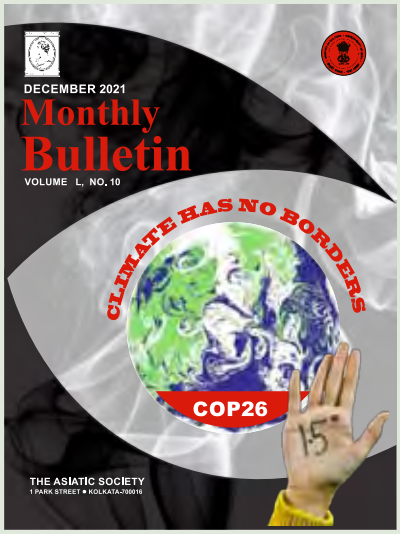


CONTENTS


- From the Desk of the General Secretary
- Meeting Notices
- Election Notification
- Paper to be read : Glasgow Climate Pact : An Account in Nutshell : **Syamal Chakrabarti**
- President's Column

***Events***

- 'Pilgrim Scholar : Alexander Csoma de Koros :Commemorative Exhibition'
- Review Meeting with Secretary, Ministry of Culture in Kolkata
- Academic Events of The Asiatic Society Since September 2021
- বিশ্ব-সংসার জয়া মিত্র
- National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow

***Articles***

- Achieve Net-Zero Save Great Hero **Asok Kanti Sanyal**
- Six Voices from and after Glasgow Summit
  - The Climate of COP26: Code Red for Humanity or Capitalism? **Elisabeth Abergel**
  - Still Mired in Growth: From COP to a Culture of Quitting **Arne Harms**
  - The Electric Car Won't Save Us **Rob Gioielli**
  - COP26 and Ocean Policy: Positive Outcomes and Challenges Ahead **Punyasloke Bhadury**
  - Glasgone--Did we Miss a Chance to Help the World's Most Vulnerable? **Dominic Hinde**
  - Enough on Emissions, Let's Talk Entanglements! Placing Environmental Humanities in Climate Conversations and Controversies **Jenia Mukherjee, Raktima Ghosh and Shreyashi Bhattacharya**
  - ***Epilogue :*** Disillusioned but Not Dead! Rising Hopes against Soaring Temperatures during and after COP26 **Jenia Mukherjee**
- COP26: A 'net nothing' Summit that the UN Termed a Global Compromise **Jayanta Basu**
- Can We Hear the Tick-Tock of Climate-Clock? **Rahul Ray**
- COP26: Where does it would lead us to **Soumen Basu**
- COP26 : "...Alive, but its Pulse is Weak" **Sreeja Das, Ria Ghosh and Puja Ray**
- Not about 'what we can do but to do what we can' COP26: A Brief Review **Suman Pratihar**
- Economists' Perspectives on Climate Change **Achin Chakraborty**
- Dissonance, Denial and Inaction in Combating Climate Change **Satyajit Das Gupta**
- Ever Mine, Ever Ours **Chandrima Biswas**
- Climate Change in the Indian Ocean World **Rila Mukherjee**
- Climate Change and History of Cyclones in Colonial Sundarbans **Mahua Sarkar**
- The Supercops' Meet on Environment Ended With a Big Bang for Business **Subhasis Mukhopadhyay**
- Global Concern for Green Globe: International Initiatives for Protecting Environment **Sabyasachi Chatterjee**
- প্রকৃতিই যদি না থাকে? কুমার রাণা
- Climate Change and Its Impact on Agriculture Land Use in the Arid Western Part of Indian Subcontinent **Amal Kar**
- Conservation Based Sustainable Tribal Livelihood **S. B. Roy and Raktima Mukhopadhyay**
- Recognizing Local Communities' Rights in Forest Policy to meet Climate Targets **Bidhan Kanti Das**
- Renewable Energy- A Possible Climate Change Solution- Perspective from Rural India **Shakko Mukherjee**
- Kochpukur: A Prospective Archaeological Site from East Kolkata Wetland Area **Punarbasu Chaudhuri, Kaushik Gangoapdhyay, Moumita Saha and Shyamal Kumar Ghosh**
- Impacts of Climate Change on Women: Reflections from the Glasgow Climate Change Conference (COP26) **Parama Chatterjee**
- High on Promises : India's Emission Control Dreams versus Reality **Fiona Mukherjee**
- Climate Change - A Glimpse of the Days to Come **Arko Bhaumik**
- Climate Change and Wildlife: Where Do We Stand? **Dishari Dasgupta**
- Climate Change: A Major Issue in North-South Dialogue **Urja Priyadarshini Chaudhury**
- Cancer from Environment and Its Prevention **Sankar Kumar Nath**
- Reality of 'Green' Digital **Samik Biswas**

***Books from Reader's Choice***

- Reflections on Climate Change **Arun Bandopadhyay**
- Forestry in British India **Sohini Das**

***Bibliography***

- Books in the Collection of the Library of The Asiatic Society on Environmental Science
- Manuscripts in the Collection of the Museum of The Asiatic Society on Biodiversity

limit. The LMDCs formal statement on this issue was "Developed countries are pushing this narrative of 1.5 degree c. very hard. We know that this narrative will lead them to control the world once again. And those countries that are not able to achieve the net-0 targets by 2050, they will be ethically and financially condemned. That is against climate justice". It emphasised upon the "collective responsibility of all nations in the Glasgow summit in trying to limit the global warming to 1.5 degree c. above pre-industrial level, as opposed to the target under Paris Agreement which put 2 degree c. as upper limit while keeping 1.5 degree c. as an aspirational goal.

Another statement issued on behalf of 45 countries participating at the Glasgow Conference stated, "to keep 1.5 degree c. alive, we need action from every part of society, including an urgent transformation in the way we manage eco-system and grow produce and consume food on a global scale. We need to put people, nature and climate at the core of our food system". Particular emphasis was given on overhauling the farming sector, curb deforestation and other land use changes that account for about a quarter of humanity's planet heating emissions. For such overhauling of the farming sector and for limiting the use of fossil fuels, a huge investment is required which the developing countries are hardly in a position to afford. As a part of collective responsibility, the developed countries need to finance – climate financing – the developing ones. On a rough estimate it was found "leveraging over $4 billion of new public sector investment into agricultural innovation, including the development of climate resilient crops and regenerative solution to improve soil health". This was a very tall order and the developed countries, while paying lip sympathy to this project, have hardly come forward to implement it.

Was the COP 26 successful in meeting the goal of climate challenge? An overall assessment of its recommendations shows that it was neither sufficient nor satisfactory. No doubt, due to India's efforts, countries agreed to "phase down" the use of coal and fossil fuels instead of the earlier phrase "phase out" as it was stipulated in the Paris Agreement. No doubt this was a momentous change as, for the first time, coal and fossil fuels are being mentioned in a COP deal. But how to meet this goal? Faced with this dilemma, the target for realising this objective was pushed forward to 2070. The climate financing agreement which was reached at in the Paris Agreement has hardly been effective in the face of the unwillingness of the developed countries to finance. The blame games being played against this backdrop are poor in climate finance and rich in hypocrisies. Faced with such a situation, Greta Thunberg, the noted environmental activist has criticised the summit by saying "COP 26 is so far just like the previous COP and that has led us nowhere". Let us now look at COP 27 which is slated to be held in Egypt in November 2022. Till then and till an agreeable and acceptable solution to the danger of climate change are worked out, mother earth is destined to suffer. The danger of environmental pollution is so much that the very existence of human civilisation will be at stake unless we solve it. It is high time that we meet this challenge forthwith.

**Swapan Kumar Pramanick**
President

# Observance of National Science Day with an Exhibition on Correspondences of Eminent Indian Scientists

On observance of National Science Day on 28th February, 2022 an exhibition of correspondences on Science was organized by the Asiatic Society, Kolkata. The programme began with the welcome address of Dr. S.B Chakrabarti, the General Secretary of the Society. The introductory speech about the observance of the day and relevance of such exhibition in the Society was given by Professor Basudev Barman, Vice-President of the Society. Dr. Asok Kanti Sanyal, the Biological Secretary deliberated his speech on the theme of this year. The excerpts from the letters of the eminent Indian Scientists like C.V.Raman, Meghnad Saha, Acharya P.C.Ray, U.N. Brahmachari, Ashutosh Mukhaerjee, P.C.Mahalanabis etc were vividly explained by Dr. Jagatpati Sarkar, Senior Cataloguer of the Museum Section. Formal vote of thanks was given by Professor Sujit Kumar Das, Treasurer of the Society. The programme was co-ordinated by Dr. Keka Banerjee Adhikari, Curator.

The programme was organized physically and an ambience was created by displaying posters on National Science Day and its theme. This programme was also live streamed on the Facebook page of the Society and received over 700 views and 148 likes. The programme was organized as a part of Azadi Ki Amrit Mahotsav (Celebration of 75th year of Independence).

# Eminent Scientists associated with The Asiatic Society

## Prafulla Chandra Ray (1861-1944)

Acharya Prafulla Chandra Ray was a member of the Asiatic Society since 1890. He was elected as the first Fellow of the Society in 1910. In the same year, 'Rasarnava', a path breaking book on Alchemy authored by Acharya P. C.Ray was published by the Society.

## Asutosh Mukherjee (1864-1924)

Sir Asutosh Mukherjee was associated with the Asiatic Society since early 1900s. He was the second Indian President of the Society and was thrice elected in the position.

## Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970)

Sir Chandrasekhara Venkata Raman was very closely associated with the Asiatic Society as a member since 1918 and this relation continued till 1935. He became the Member of the Council of the Society in the year 1922 and also acted as the Treasurer of the Society.
Sir C.V.Raman discovered the 'Raman Effect' on 28th February 1928, a discovery in the field of scattering of light, using a spectrograph that he developed. He was awarded the 1930 Nobel Prize in Physics for this discovery and was the first Asian to receive a Nobel Prize in any branch of Science.

National Science Day is celebrated in India on 28th February each year to mark the discovery of the 'Raman Effect' by Indian Physicist Sir C.V.Raman on 28th February 1928.

## Upendranath Brahmachari (1873-1946)

Sir Upendranath Brahmachari, a leading medical practitioner of his time worked with the materials of the Asiatic Society for his scientific experiments. He synthesized Urea- Stibamine as a medicine for cure of the dreaded disease of Kalazar. He was President of the Society during 1928-29.

## Meghnad Saha (1893-1956)

Professor Meghnad Saha was associated with the Asiatic Society as a member since 1917. He was elected as a Fellow of the Society in 1930 and became the President of the Society in 1945.

## Prasanta Chandra Mahalanobis (1893-1972)

Professor Prasanta Chandra Mahalanobis was associated with the Asiatic Society as a member since 1920. In the year 1924, he was elected as the Physical Science Secretary of the Society. Many of his papers were published in the Journal of the Asiatic Society.

## Satyendra Nath Bose (1894-1974)

Professor Satyendra Nath Bose was closely associated with the Asiatic Society as a member since 1917. He was the President of the Society during 1966 -1969.

# International Seminar on Syamadas Chatterjee: A physicist of many splendours

The 15th of March, 2022 - was a historic day for the Asiatic Society, Kolkata when we decided to organize a one day international seminar in memory of the Late Professor Syamadas Chatterjee, experimental physicist extraordinaire - in collaboration with the Biren Roy Research Laboratory for Archaeological Dating & the School of Studies in Environmental Radiation and Archaeological Sciences, Jadavpur University, Kolkata.

The event, as christened by the eminent physicist, Professor Bikash Sinha - "Syamadas Chatterjee: A Physicist of Many Splendours!", - proved to be doubly auspicious as it propitiously coincided with the Government of India's 75 week long, national programme to celebrate 75 years of Independence, titled "Azadi ki Amrit Mahotsav" which began on the 12th of March, 2022 - where a significant amount of attention has been commitedly reserved to revisit the unsung heroes in

Professor Debasis Ghosh, on behalf of the Professor Syamadas Chatterjee Foundation Trust, handing over a signed document withdrawing their stake from the Syamadas Chatterjee's residential building at Ballygunj Place, Kolkata, in favour of The Asiatic Society, Kolkata.

various fields, who have not only made significant contributions to the development of India, but have unfortunately remained in relative obscurity despite leaving indelible imprints in their respective fields as if by phantom hands, but have also brought laurels and global recognition to the country, in the process - thereby cementing India's exemplary international standing in such fields.

The event, which was held in hybrid mode, that included both offline and online facilities, at the venerable Vidyasagar Hall in the William Jones Building of the Asiatic Society, Kolkata in Park Street, Kolkata - was attended by luminaries, distinguished guests and enthusiastic audience from around the world. A long list of eminent scientists, public intellectuals and distinguished members of the academia recounted the life and times of Professor Syamadas Chatterjee while others delivered lectures on topics pertinent to the scientific, academic and research contributions of the late Professor Chatterjee in order to highlight the rich legacy left behind by this great experimental Physicist.

From the momentous discovery of spontaneous fission to revealing the radioactive content in rainwater and the human body - from founding the Cosmic Ray Hut at Jadavpur University, Kolkata in the 1960's to his groundbreaking exploits in the field of application of terrestrial helium along with mining of the same at Bakreshwar, West Bengal - Professor Chatterjee was a true pioneer. He was also an exceptional teacher of physics. After graduating from the erstwhile Presidency College - affiliated to the University of Calcutta - he subsequently pursued his M.Sc in physics from the University Science College, University of Calcutta. From fission studies to hot springs, from cosmic rays to radio carbon dating - Professor Chatterjee's range of research activities is simply mind-boggling.

Additionally, Professor Syamadas Chatterjee was an exceptional inventor and innovator - who preferred to build his own instruments and design experiments - in the tradition of stalwarts like Sir J. C. Bose, who was a master instrument builder himself. Professor Chatterjee inspired research in many fields throughout his life, since he first joined the Bose Institute till his retirement from Jadavpur University, Kolkata and then, post retirement, his research engagements at the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. He also visited many foreign universities on prestigious fellowships to pursue post doctoral work or on brief teaching stints in Ottawa, Canada; Carnegie Institution, USA; laboratories at Heidelberg, Germany; Technical University, Munich, Germany and so on.

With publications in reputed journals such as the "Nature" - Professor Chatterjee inspired generations of experimental physicists in India. Professor Chatterjee was a true pathfinder, who got to brush shoulders with titans like Professor Satyendra Nath Bose - who inspired him to take up explorations of the hot springs in Bakreshwar, in the first place. Professor Syamadas Chatterjee had dedicated his entire life to the pursuance of science in India and had even donated a significant portion of his ancestral home to the S. D. Chatterjee Foundation which he had set up himself and to which he had bequeathed all the instruments and books that he had in his personal possession.

At the International seminar we had Dr Satyabrata Chakrabarti, the honourable General Secretary, Asiatic Society, Kolkata - deliver a most wonderful welcome address. This was followed by an introductory address by Professor Dipak Ghosh, Emeritus Professor, Jadavpur University, Kolkata - where Professor Ghosh - who is also the author of the Bengali book, "Bakreshwar Upakhyan", and published by the Asiatic Society, Kolkata - was launched at the Press Corner of the recently concluded 45th Kolkata International Book Fair, 2022, on the 5th of March, '22.

We then had the former Vice Chancellor,

Professor Bikash Sinha

Professor A.N. Bose

Professor Dipak Ghosh

Professor Anuradha Lohia

Professor Manisha Chakraborty

Professor Maniklal Majhi

Professor Sugata Hajra

Professor Argha Deb

Professor Naba Kumar Mondal

Professor Debasis Ghose

Jadavpur University, Professor A. N. Basu, reminisce about the late Professor Chatterjee, titled, "Professor S. D. Chatterjee and His World", which was most inspiring. This was followed by the delivery of the Presidential address by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Asiatic Society and the Vote of Thanks delivered by Dr Sujit Kumar Das, Treasurer of the society. This was followed by three successive sessions of invited lectures, delivered by prominent scientists, university professors and respected members of the academia.

The first session was chaired by Professor Anuradha Lohia, Vice Chancellor, Presidency University, Kolkata. In this session we had renowned physicist, Professor Bikash Sinha, INSA Senior Scientist, deliver the Keynote Lecture titled "Syamadas Chatterjee: A Physicist of Many Splendours". In the same session, we had Professor Naba Kumar Mandal of SINP, Kolkata deliver the plenary lecture titled, "Syamadas Chatterjee and Cosmic Ray Research in India", while Dr Debasis Ghosh of VECC, Kolkata lectured on Professor Chatterjee's work on helium in his talk titled, "Syamadas Chatterjee: a deep understanding of terrestrial helium".

In the second session we had three more plenary lectures by eminent scientists. They were delivered by Professor Rajkumar Roychowdhury, Physical Science Secretary of the Society and Professor Sugata Hazra from Jadavpur University, Kolkata. Professor Rajkumar Roychowdhury in his brief addressed stressed on the association of The Asiatic Society, Kolkata with the doyens of science of 19th and 20th century. Professor Sugata Hazra, a Professor of Oceanography in Jadavpur University stressed on vulnerability and impact of Climate Change on Sundarban delta regions in his talk titled "Mangroves and the sea". Professor Joyashree Roy, a Professor of Economics, Jadavpur University

and currently Bangabandhu Chair Professor, Asian Institute of Technology, Thailand, in her virtual lecture stressed on the impact of Climate change in framing 21st century growth agenda. This session was chaired by the respected Registrar, Jadavpur University, Kolkata, Professor Snehamanju Basu, who joined online.

In the third and final session of the day, we had Professor Maniklal Majhi deliver the plenary lecture titled, "Professor Syamadas Chatterjee: a dedicated scientist". Professor Majhi gave a detailed account of the life of this exceptional physicist and professor. In the same session, Professor Argha Deb, who is currently the Director of Biren Roy Research Laboratory for Archaeological Dating & School of Studies in Environmental Radiation and Archaeological Sciences, Jadavpur University, laboratories which were created under the guidance and able leadership of Professor Chatterjee, talked about the various interdisciplinary researches currently going on at the Laboratories. This included radon anomaly detection as a precursor to earthquake detection, estimation of alpha radioactivity in blood cells to have an idea about possible ailment pattern and radiological impact of radon in groundwater resources. In the concluding talk, Professor Kalyan Kumar Chatterjee, currently Head of Physics Department, Jadavpur University talked in detail about the research going on in his laboratory of Nano-science Technology and Semiconductors. He also stressed on the fabrication of new instruments, a genre much encouraged by Professor Syamadas Chatterjee.

At the end of the third session we were extremely pleased to learn that the Asiatic Society, Kolkata - post amicable settlement of some long standing legal issues with the S. D. Chatterjee Foundation - has decided to renovate the ground floor of the three storey building of the late Professor Chatterjee, at Ballygunge, and transform it into a research centre, to be set up collaboratively with other reputed institutions, where research into the philosophy and history of science will be pursued among other scientific investigative endeavours.

And thus the day-long international seminar ended on a high note, with Professor Manisha Chakraborty, Department of Bio-science & Engineering, Jadavpur University, regaling the august gathering, with a beautiful Rabindra Sangeet.

২৫০ টাকা

না! এটা কোনও পৌরাণিক উপাখ্যান নয়--- এ এক পদার্থবিদের সাধনার ইতিবৃত্ত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরে যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে অনেকেই যাঁর কথা ভাবেন তিনি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের পথিকৃৎ এবং প্রাণপুরুষ অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। আজকের দিনে অনেকের কাছেই শ্যামাদাসবাবুর কাজকর্মের বিশেষ করে গবেষণার ডাইমেনশনই অজানা। নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো জানানো কর্তব্য। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্ররাই নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করার জন্যেও এই ধরনের বই লেখার প্রচেষ্টা।

# Seminar-Exhibition on the Handloom Industry of Bengal: Its Past, Present and Future—A Report

A seminar cum exhibition on the handloom industry-its past present and future was held on 23rd and 24th March 2022 at the Rajendra Lala Mitra Bhavan, the second campus of The Asiatic society in Salt Lake. Many academics as well as weavers from different parts of West Bengal joined the seminar. Activist working in weavers' cooperatives and different marketing activities and Government officials also actively participated in the seminar. The inaugural session started with the opening song by Shri Amit Ghosh, Assistant Maintenance Engineer, The Asiatic Society.

Dr. Asok Kanti Sanyal, Biological Secretary, presented the welcome address. Dr. Sujit Kumar Das, coordinator of the seminar then introduced the theme of the seminar. Sri Haripada Basak, former member of the Steering Committee, Yojana Commission, Govt of India and a weaver himself, who was actively associated with the settlement of the weavers coming from erstwhile East Pakistan in Fulia, Nadia, was the chief guest. In his speech, Sri Basak described his lifelong involvement in the industry as an active member of a weaver family. He discussed the past and present conditions of the industry, narrated the life style of the weavers in the villages of West Bengal and also focused on the actual problems which seem to threaten their future. He highlighted the basic conflict of Handloom with Power loom and explained the problems faced by the present weavers from the use of Power loom and the use of synthetic thread with indigenous cotton in the power loom. In his view most of the present cotton clothes were prepared with a mixture of indigenous cotton and synthetic thread which was hazardous for the health of the weavers. In his opinion cotton produced by the Power loom may be durable and bright but its quality is very poor. This is another important reason behind the reduction of demand of Indian cotton clothes in foreign market in comparison with Bangladesh Cotton clothes. It also adversely affected the aesthetic and artistic quality of the products. He also pointed out the scarcity of finance for maintaining their livelihood. Professor Subhas Ranjan Chakraborty proposed the vote of thanks. Professor Swapan Kumar Pramanik, President of the Asiatic Society presided over

Professor Pallab Sengupta

Shri Haripada Basak

Dr. Sujit Kumar Das

the function and delivered the presidential address.

The weavers from different part of Bengal brought their authentic products which were displayed in the ground floor as a part of the exhibition. The local residents of Salt Lake also attended the exhibition in large numbers and appreciated the products which encouraged the weavers present in different stalls. There were products from Shantipur, Dhaniakhali, Fulia, Bisnupur and Begumpur. The exhibition was inaugurated by Sri Shyamal Kanti Chakraborty, former Director of the Indian Museum.

The first technical session was presided over by Professor Arun Kumar Bandyopadhyay, the Archaeological and Historical secretary of the Asiatic Society. Professor Sharmistha Banerjee of Calcutta University was the inaugural speaker who spoke about the development of production system in the handloom weaving of West Bengal. Niloy Kumar Basak Assistant Teacher of Nagadi Obaidia High School, who himself was a weaver by birth, spoke on " তাঁতশিল্পকেন্দ্র ফুলিয়া; তন্তুবায় সমাজের জ্ঞান, দক্ষতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এক অভিবাসন তথা পুনর্বসতির ইতিহাস"। The next speaker Debasis Bandyopadhyay, an young journalist and researcher, presented বাংলার তাঁত – সেকাল একাল, based on his experience about the weavers of Nabadwip. Sri Sailendrenath Kundu, from Dhaniakhali, former Manager of the century old Cooperative Society, The Somospur Union Co-operative Weavers Society Ltd., described the condition of the weavers of Dhaniakhali, a traditional weaving centre of Bengal. Professor Arun Bandyopadhyay summed up the papers and added his own comments in his address as the Chair.

Sri Sukhabilas Barma a well-known personality with social commitment, chaired

the next session. The first Speaker was Chandan Shafiqul Kabir, originally from Bangladesh but now in Uk, who joined the seminar through Google meet. He spoke on ঢাকাই বস্ত্রশিল্প, সমকালীন বিতর্ক ও বাহাস। The next speaker was Professor Kakali Dhara Mondal, Professor, Folklore Department of Kalyani University, who spoke on মুর্শিদাবাদের সিল্ক-সম্ভাবনা ও সংকট। She presented the problem faced by the weavers of Murshidabad and suggested a possible solution through the cooperative society movement. She pointed out the pressure of middle-man and some wealthy traders on the primary weavers.

Professor Tapati Mukherjee, Former Director, Rabindra bhavan. Visvabharati, could not be present and her paper describing old literary records of Handloom entitled "সাজাবো যতনে" was read out by Smt. Bandana Mukherjee. Dr Mukherjee used Sanskrit literary sources from Rig-Veda to Kalidasa to present a detailed picture of the use of cotton clothes, techniques of preparation and cleaning of varieties of cotton and silk clothes and their use in ancient India.

Sneha Agarwal, Research scholar, The Asiatic society, Kolkata presented a note on Mandasore inscription, which recorded the plight of silk growers who migrated from Murshidabad. Entitled. "রেশম শিল্পীগোষ্ঠীর মান্দাসোর অভিলেখের আলোকে তৎকালীন রেশম শিল্প ও রেশম শিল্পী ( 436 CE - 473CE)".

Sri Sukhabilas Barma presented his presidential speech with a "Gambhira song" from Malda district.

The Second day started with the third Technical session chaired by Professor Pallab Sengupta. The first speaker Shri Debasish Roy, Director General, Indian jute Mills association and, and the second speaker Dr Chandan Roy, Associate professor&Head of the Department, Economics.Kaliaganj College, Uttar Dinajpur both discussed the value of using digital platform for sale and purchase of raw materials and clothes, and stressed the need to use modern technology for production and improvement of design. Dr Subhasis Chakraborty, Associate Professor, Arambagh Girls College , Hooghly presented his paper on "Problems & Crisis of Handloom Industry of West Bengal". He unravelled a lot of problems faced by the weavers from Begampur, Fulia, Shantipur, Murshidabad, Bishnupur, like lack of modern techniques, very low wages (only 300/- rupees per day), gradual decline in the number of looms because of the pressure of Mahajanas and other middleman. Lack of cooperative managerial skill, inadequate institutional support in comparison to the need of weavers resulted in a large number of weaver abandoning the loom for other occupation. The effect of Covid-19 was also felt acutely. He suggested some possible ways to try and solve these problems.

The last speaker of the session, Dr Sujit Kumar Das, presented his paper on "বারব্রত পালা পার্বণে বাংলার তাঁতি" where he explained the folk elements associated with the profession of Weavers, their religious divisions, commitment to the caste and their involvement in socio religious functions.

Before the last academic session Dr Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, the Asiatic Society, Kolkata expressed his view on the handloom weaving and expressed his concern for the weavers who form a large part of our society.

The 4th technical session was chaired by Prof. Sisir Kumar Majumder. In this session weavers from different areas of west Bengal expressed their views and participated in the discussion. Prof. Sabyasachi Chottopadhyay, Head of the Dept. of History, Kalyani University helped professor Sisir Majumder to coordinate the discussion. Shri Rajesh Chatterjee from the Weavers service centre, Kolkata, Ministry of Textile described how the modern technologies are being installed in different districts of West Bengal. Community development programmes forming clusters for weavers' development are being implemented with the cooperation of the State implementing agency. He also described how new designs

are developed to dynamically change the status of the weavers. He cited the story of Begumpur cluster development programme which was supported by the representatives from Begumpur present in the seminar. Shri Swadesh Pramanik, Manager, Shantipur Kutirpara Cooperative weavers' Society Ltd discussed the problem of the weavers in selling their products through the middle-men (Mahajans). They have to hand over their products to the Mahajans, but they receive a very low price which makes it impossible to sustain themselves. But Mahajans sell their product at a high rate. He also suggested some way out of these problems.

Prof. Sabyasachi Chottopadhyay, summed up the discussion of the 4th technical session with his own opinion and views.

The valedictory session of the program was very interesting. In this session Shri Rajesh Chatterjee presented one video clipping where a whole cloth of muslin was seen to be passing through a ring, the fact which we read in the books unfolded before our eyes by the effort of the expert weavers under the supervision of Weavers Service Centre Kolkata. .

The programme ended with a vote of Thanks to all who worked hard to make the seminar successful.

# এশিয়াটিক সোসাইটিতে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপন

৮ মার্চ, ২০২২ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতায় কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক নারীদিবস। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী সুজাতা মিশ্র। তিনি শুরুতেই আন্তর্জাতিক নারীদিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শ্রী অমিত ঘোষের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচিত হয়। শ্রীমতী শক্তি মুখার্জী শ্রম বিভাজন ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করেন। শ্রী অরূপরতন বাগচী ও শ্রীমতী বন্দনা মুখার্জী তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং নারীস্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলি তুলে ধরেন। শ্রীমতী অমিতা ভট্টাচার্য ঘোষাল ও মোহনা ভট্টাচার্য যথাক্রমে একটি স্বরচিত কবিতা ও গান পরিবেশন করেন। শ্রীমতী অনিতা রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সোসাইটির রিসার্চ ফেলোদের সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বক্তব্য রাখছেন ইন্টারনাল কমপ্লেনট কমিটির চেয়ারপার্সন ডঃ বন্দনা মুখার্জী

# বইমেলায় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৩টি নতুন বই

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ১১ মার্চ— এবারের কলকাতা বইমেলায় ১৩টি বই প্রকাশ করলো এশিয়াটিক সোসাইটি। বৃহস্পতিবারই মেলায় সোসাইটির প্রদর্শনী কক্ষে সাধারণ সম্পাদক ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির প্রকাশনা সচিব ড. রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি। বইগুলির লেখক, সম্পাদকসহ বহু বিশিষ্টজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *দি স্যাংস্কৃট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল* (পুনর্মুদ্রণ), দীপক ঘোষের *বক্রেশ্বর উপাখ্যান*, সোমা বসু (সিকদার) এবং নিকোলাস কাজানাসের *পোয়েট্রি অ্যান্ড কম্পোজিশনাল স্ট্রাকচার অব দি স্যাংস্কৃট বুদ্ধিস্ট ন্যারেটিভ সুপ্রিয়া সার্থবহ জাতক ইন ভদ্রকল্পপবদনা*, শতরূপা দত্ত মজুমদারের *হিস্ট্রি অব লিঙ্গুইস্টিক সায়েন্স ইন নর্থইস্ট ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি বোড়ো গ্রুপ অব ল্যাঙ্গুয়েজেস: রেট্রোস্পেক্ট অ্যান্ড প্রসপেক্ট*, অঞ্জন বেরা সম্পাদিত প্যাট লোভেটর *জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া*, রিলা মুখার্জি সম্পাদিত *অর্ডার/ডিসঅর্ডার ইন এশিয়া*, কুমার রাণা ও সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত পল ওলফ বোডিং-র *সান্তাল ফোকটেলস*-র বাংলা তর্জমা *সাঁওতাল লোককথা*, ভুল্লি ধনরাজু সম্পাদিত *প্রবলেমস অ্যান্ড প্রসপেক্টস অব সিক্সথ শিডিউল: টুওয়ার্ডস ট্রাইবস অটোনমি অ্যান্ড সেলফ গর্ভনেন্স*, সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী সম্পাদিত *এডিটিং অব আনপাবলিশড এনসিয়েন্ট টেক্সটস: অ্যান এক্সপেরিয়েন্স অব স্যাংস্কৃট, পালি অ্যান্ড প্রাকৃত*, শ্রাবন্তী বসু সঙ্কলিত এবং সত্যরঞ্জন ব্যানার্জি ও অমিত ভট্টাচার্য সম্পাদিত *এ ডেস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব স্যাংস্কৃট ম্যানুস্ক্রিপ্টস ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কালেকশান অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি* (প্রথম খণ্ড) প্রভৃতি। এশিয়াটিক সোসাইটির স্টল (৩৪২ নং) থেকে বইগুলির বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে। বইমেলা উপলক্ষে এতগুলি বই একসঙ্গে প্রকাশের জন্য বক্তারা সোসাইটির উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

# Souvenir items displayed and sold at International Kolkata Book Fair 2022

# Exhibition of Artwork by Children and Adults with Autism at the International Book Fair, 2022

**Mitu De**
Secretary (Hony) & Head of Research and Academic Studies Unit, Autism Society West Bengal (ASWB)

Individuals with autism have difficulty in communication and expressing their feelings is a common notion. However the Artwork by students and trainees of Dikshan & Aarohan units of Autism Society West Bengal (ASWB) that were on display in an exhibition in collaboration with The Asiatic Society at the International Book Fair that was held in Kolkata during 28th February, 2022 to 13th March, 2022 has made many question this common notion. The artwork exhibition was a clear example of what anyone could achieve with appropriate support. Each one of us needs support in various ways and in various phases of life. Persons with autism may need support a bit more than other people without any disability. This artwork exhibition was a clear indicator that with appropriate support and reasonable accommodations anything was possible.

**Artwork exhibition**

The theme of the exhibition was 'There were 75 artistic expressions to commemorate the 75 years of India's Independence. It was a part of the "Azadi ke Amrit Mahotsav" initiative declared by the Government of India to commemorate 75 years of Independence. The artwork was made with the support of special educators associated with Autism Society West Bengal, a not for profit organisation that believes in and advocates for the rights of individuals with autism. Some of the artwork was made with parental support. There were several videos which captured the budding artists creating their artwork with the support of their special educators or parents. The videos showed how each individual with autism is different and so the support required is also different. 'One size fits all' doesn't work with

individuals with autism with regard to the appropriate supports required. This is one reason that autism is still a poorly understood or misunderstood developmental disability among the general masses.

Art is a great leveller. Art has the capacity to touch the hearts of many different people who may have a different outlook. It was overwhelming to see visitors of different walks of life coming and viewing this unique exhibition. Many were taking pictures and making videos of the 75 artistic expressions by children and adults with autism commemorating the 75 years of Independence going on in the International Book Fair at Kolkata. Many of the visitors expressed their views about the exhibition. These comments would be read out to the students and trainees of ASWB later so that they get to hear what other people thought of their artistic expressions. *The International Kolkata Book Fair* is the largest *Book Fair* in the *world*, organised by Publishers & Booksellers Guild. Visitors of diverse backgrounds came to view the exhibition.

Some of the artists, both veteran and budding, came to the Book Fair to view the exhibition. The proud expressions of these artists as they posed with their artwork were enough to communicate that they appreciated this platform. Many came with their parents, siblings, friends, colleagues. As pictures of this exhibition were posted in the social media word spread and visitors increased. Staff from ASWB was around every day to answer queries related to autism by any visitor.

This artwork exhibition provided a space where general public could get some information about autism if they were interested. The Asiatic Society, Kolkata, founded in 1784, is the oldest institution of learning in India and has made a seminal contribution in the revival of Indian history and heralding its renaissance. Asiatic Society's basic mandate that was issued by its founder Sir William Jones was that it would work with "what is performed by Man and produced by Nature." As time progressed and new concepts in human knowledge developed the Asiatic Society adhered to the basic mandate and forged into new areas.

Awareness about different kinds of disability, more so the invisible disabilities like autism, needs to be done in common public spaces. This platform given by Asiatic Society in collaboration with Autism Society West Bengal (ASWB) gave a fillip to the autism awareness agenda of ASWB. The Book Fair

was a unique common space. Everyday new people came to the Book Fair. The book 'Understanding Autism' edited by Dr Subir Kumar Dutta & Dr Mitu De published by The Asiatic Society in 2019 was available at the Book Fair in both the Asiatic Society stalls number 342 & 489. This artwork exhibition focussed more on the creativity of the artists rather than their inherent disability, Showcasing their talent and diverse modes of expression highlighted autism and neurodiversity.

**Neuro-diversity**

Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neuro-developmental disorder characterized by persistent deficits in social communication and interaction and stereotyped behaviors, interests, and activities. Autism is four times more common in boys than in girls. Autism Spectrum Disorder (ASD) happens when the brain develops differently and has trouble with an important job: making sense of the world. Every day, our brains interpret (understand) the things we see, smell, hear, taste, touch, and experience. But when someone's brain has trouble interpreting these things, it can make it hard to talk, listen, understand, play and eventually learn.

The exact etiology of ASD remains elusive, a combination of genetic and environmental factors during critical periods of development has been implicated possibly leading to altered brain architecture beginning early in life. In recent years the term Neuro-diversity has become quite common. Neurodiversity is a modern concept that states that brain differences are normal rather than deficits. The individuals with autism are neuro-divergent. Their inherent neuro-diveregence makes them experience, interpret and interact with the world in their unique ways. This artwork exhibition with video display showcased their uniqueness, as an outcome of their neuro-diversity. Different brains work differently. Recent research states that neuro-diversity is as important as biodiversity.

The artwork by different individuals was different. The medium of expression was varied too. Some used crayons & sketch pens to colour. Others used pasting coloured papers to create their artwork. One innovative student used matchsticks to create his artwork. Another used pulses and oats to create the tricolour. Despite having a disorder whose prime challenging areas is communication these artists with autism have expressed their feelings regarding the 75 years of India's Independence. All students of Dikshan and trainees of Aarohan needed some extent of support. But then who doesn't need help and support during the journey called Life?

The artwork exhibition by students & trainees with autism provided a platform for expressing their thoughts and ideas about the 75 years of India's Independence during the International Book Fair 2022. ASWB is indebted to all concerned at the Asiatic Society especially Prof Ramkrishna Chatterjee for this collaboration with Autism Society West Bengal (ASWB).

# Sun God Image, Nasigram, Purba Bardhaman

**Rangan Kanti Jana**
Former Curator, Museum and Art Gallery, The University of Burdwan

In the geographical space of undivided Bengal (i.e., West Bengal and independent Bangladesh) a huge number of solar images are reported to have been discovered. Most of these images had been recorded by R.D. Banerjee[1], Monomohan Ganguli[2], N.K. Bhattasali[3], Enamul Haque[4], M.S. Bhattacharya[5], B. Chattopadhyay and R.K. Jana[6] and many others. Till the recent years a number of images are known from different parts of Bengal which are not incorporated in the aforesaid catalogues and books. Through archaeological explorations within the districts of Purba and Paschim Bardhaman several solar images and several fragmented parts are reported to have been located by the author himself.[7] Recently, one metal image has been located during the field exploration.

During this exploration work within the geographical space of Bhatar Block, one place (now deserted) with a silted pond has been located, which is known as 'Mitrapur' (J.L. No. 103). The pond is locally known as 'Mitra Pukur'. Once upon a time, the soil of Mitra Pukur was used as the external medicine for the various skin diseases by the villagers.

**Sun God (Briddharal)**
Provenance: Nasigram (J.L. No. 089), Block : Bhatar, Purba Bardhaman
Material: Metal (Octoalloy)
Size : 18'' x 6''
Time : Early medieval period
Description: The God stands on a lotus pedestal wearing shoes in the Samapadasthanaka posture. He holds two lotus buds by his two hands. The lower part of his body is covered by 'Dhoti' with a decorated waist belt. The upper part of his body is uncovered. The image is ornamented and wears a headgear which is not like 'Kiriti Mukuta'. This is the only image which is so far known from the aforesaid geographical space. This image is locally known as 'Bura-ral' or 'Briddharal'. The God is considered as a curative God of skin diseases.

'Mitrapur' (J.L. No. 103)

## References


1. Banerjee, R.D., *Eastern Indian School of Medieval Sculpture*, New Delhi, 1998, pp. 117-18
2. Ganguly, Manomohan, *Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad*, Calcutta, 1988, pp. 75-79
3. Bhattasali, N.K., *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* Dacca, 1929, pp. 157-73
4. Haque, Enamul, *Bengal Sculptures Hindu Iconography up to C. 1250 A.D.,* Dacca, 1992, pp. 177-95
5. Bhattacharya, Malay Sankar, *Art in Stone: A Catalogue of Sculptures in Malda Museum*, Malda, 1982, pp. 15-21
6. Chattopadhyay, B and Rangan Kanti Jana, *Descriptive Catalogue of Sculptures,* Museum and Art Gallery, The University of Burdwan, Burdwan, 2001, pp. 23-26
7. Jana, Rangan Kanti, 'Some Solar Images from Purba and Paschim Bardhaman Districts, West Bengal', *Pratnatattva*, Silver Jubilee Volume, Vol. 25, Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University, Dhaka, June 2019.

## *On the* MUSICAL MODES *of the* HINDUS: *written in* 1784, *and since much enlarged.—By the* PRESIDENT.

MUSICK belongs, as a *Science*, to an interesting part of natural philosophy, which, by mathematical deductions from constant phenomena, explains the causes and properties of sound, limits the number of mixed, or *harmonick*, sounds to a certain series, which perpetually recurs, and fixes the ratio, which they bear to each other or to one leading term; but, considered as an *Art*, it combines the sounds, which philosophy distinguishes, in such a manner as to gratify our ears, or affect our imaginations, or, by uniting both objects, to captivate the fancy while it pleases the sense, and, speaking, as it were, the language of beautiful nature, to raise correspondent ideas and emotions in the mind of the hearer: it then, and then only, becomes what we call a *fine art*, allied very nearly to verse, painting, and rhetorick, but subordinate in its functions to pathetick poetry, and inferior in its power to genuine eloquence.

Excerpts from the article authored by Sir William Jones and published in the *Asiatick Researches*, Vol. III, 1792.

# শিল্পীর তুলিতে দুই কিংবদন্তি

শিল্পী ঃ স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

# আধুনিক সঙ্গীতের মননে বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ

**শঙ্খ সান্যাল[১], অর্চি ব্যানার্জি[২] ও দীপক ঘোষ[৩]**
[১]স্যার সিভি রমন সেন্টার ফর ফিজিক্স অ্যান্ড মিউজিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
[২]রেখী সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর দ্য সায়েন্স অফ হ্যাপিনেস, আইআইটি খড়গপুর
[৩]শ্রুতিনন্দন স্কুল অফ মিউজিক, কলকাতা

১৮৮১ সন, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হলে বেথুন সোসাইটির আয়োজিত অনুষ্ঠান। ২০ বছরের তরুণ কবি বক্তৃতা দিচ্ছেন "সঙ্গীত ও ভাব" বিষয়ের উপর। বলছেন "বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠ্যং তিষ্ঠতি অগ্রে', আর একজন বলেন কোন কোন রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো।" আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের আধুনিক সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথের দিশা। সত্যি তো, সঙ্গীতে তো ভাবের প্রকাশই মূল কথা, সেই ভাবের কথাই যদি আমাদের গবেষণার মাধ্যমে, আমাদের ভাবনার মাধ্যমে আনতে না পারি, তাহলে যেন একরকম ভাবের ঘরেই চুরি করা হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার পরে অবিশ্যি কেটে গেছে অনেক কটা দিন; এই ধরনের গবেষণা কিম্বা পঠনপাঠনের চেষ্টা সেভাবে হয়নি কখনও। তবে রবীন্দ্রনাথের আগেও দু-একজন দার্শনিক সঙ্গীতের বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক G.W. Leibnitz সম্ভবত প্রথম এইভাবে সঙ্গীতের একটা সংজ্ঞা দেন। "Music is the pleasure the human mind experiences from counting, without being aware that it is counting"। আজকের দিনে Artificial Intellingence বা Neural Network নিয়ে যেসব গণিতজ্ঞ নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন সঙ্গীতের এই গঠনতন্ত্রে। এইভাবে সঙ্গীতকে বিজ্ঞানের রসে জারিত করে ভাবা এবং আমাদের রোজকার জীবনে এর প্রয়োগের কিছু কিছু টুকরো গল্প একজায়গায় করে এই লেখা।

সঙ্গীত নিয়ে আমাদের গবেষণার শুরুর কথা বলতে হলে অল্প একটু গৌরচন্দ্রিকা সেরে নিতে হবে Chaos Theory বা বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব নিয়ে। শুনতে বিশৃঙ্খল হলেও এই তত্ত্বের মূলে আছে এক জটিল শৃঙ্খলা-বোধ, যা খালি চোখে হয়তো দেখা যায় না, অনুভব করা যায় জটিল অংকের সাহায্যে। প্রযুক্তিবিদ John Gall-এর অভিজ্ঞতায় "A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that works" – অর্থাৎ কিনা যে কোনও আপাত জটিল সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে কোনও সহজ তত্ত্বের মধ্যে। প্রকৃতির হরেক নিয়ম আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত, এর উৎস খোঁজার সহজ উপায় বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ব্যবহার। আধুনিক গণিত এবং কম্পিউটারের অবিশ্বাস্য গতিতে হিসেব করার

ক্ষমতা, এই দু'টো বিষয়কে কাজে লাগায় Chaos ভাবনা। প্রকৃতির ঘটনাগুলো আমরা যদি ভাবতে থাকি - আবহওয়ার হঠাৎ হঠাৎ পাল্টে যাওয়া - হঠাৎ মহামারীর প্রাদুর্ভাব - জীবকোষের metabolism - পাখি, পোকামাকড়দের সংখ্যা হঠাৎ পাল্টানো, সভ্যতার উত্থান এবং পতন, এমনকি আমাদের স্নায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি এসবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে অপারগ। Chaos Theory-এর একজন প্রধান আবিষ্কর্তা হলেন এক মার্কিন আবহাওয়াবিদ Edward Lorenz, তাঁর কৃত এক সামান্য ভুল খুলে দিল আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত, আমরা বুঝতে পারলাম প্রাথমিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন, কি ভয়ংকর পরিবর্তন করে দেয় একটি system-এর অন্তিম অবস্থার – বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর নাম Butterfly Effect। কি ছিল সেই ভুল? Lorenz সাহেব একটা শর্ট কাট পদ্ধতিতে বড় দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্স স্টাডি করছিলেন, কম্পিউটারে রান করানোর সময় প্রথম থেকে না করে শুরু করলেন মাঝখান থেকে, আগের প্রিন্ট আউটের একটা নাম্বার দিয়ে। কম্পিউটার রান করিয়ে বেড়িয়ে গেলেন কফি খেতে, ফিরে এসে যা দেখলেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। Weather-এর যে নতুন রেজাল্ট বেরলো তা অরিজিনালের থেকে যোজন ক্রোশ দূরে - একদম যেন দুটো আলাদা সিস্টেম। Lorenz সাহেবের হঠাৎ মাথায় এল গণ্ডগোলটা কোথায়। যে সংখ্যাটা স্টোর করা ছিল প্রিন্ট আউটে তা হল ০.৫০৬ কিন্তু কম্পিউটার মেমোরিতে আসল নাম্বারটা ছিল ০.৫০৬১২৭। এই সামান্য তফাৎ, ৫০০০ ভাগের মধ্যে এক ভাগ, এই তফাতের জন্যেই ঘটে গেল আকাশ পাতাল পরিবর্তন! উনি ভাবলেন তাহলে একটা ফুঁ দেবার মধ্যেও তফাৎ হলে ঘটাতে পারে মহাপ্রলয় - এটাই পরে Butterfly Effect নাম হল।

এবারে আসা যাক, এই Chaos তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের মানুষের মস্তিষ্কের উপর প্রভাবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কীভাবে করে থাকি সেই আলোচনায়। Chaos এবং complexity - এই দুইয়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে আমাদের সমগ্র জগৎ সংসার। complex system তাদেরই বলা হয়, যাদের ভিতরে অনেক প্যারামিটার এক সাথে কাজ করে এবং এই আন্তঃক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ আমাদের

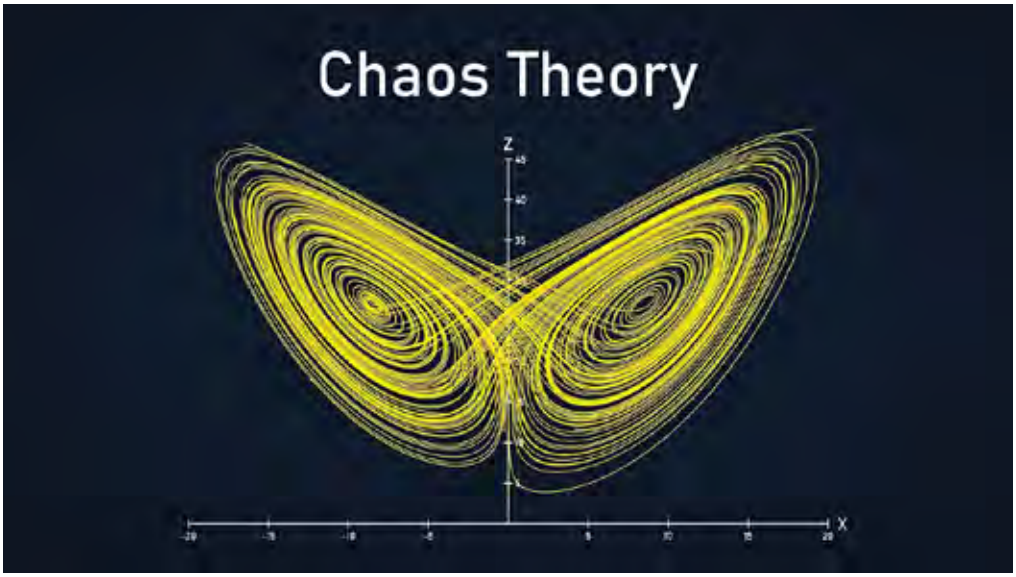


**Butterfly Effect-এর গাণিতিক ছবি**

কাছে ধরা পড়ে মাত্র দু-তিনটে প্যারামিটারের মাধ্যমে। সহজ ভাষায় বললে, সঙ্গীত হচ্ছে man made complex system আর আমাদের মস্তিষ্ক natural complex system আর এই দুটোর যোগসাজশ, সমন্বয় ঘটলেই আমাদের মধ্যে ভালো লাগা জন্মায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের গবেষণাগার, স্যার সিভি রমন সেন্টার ফর ফিজিক্স অ্যান্ড মিউজিকে সেই যোগসাজশের সন্ধানই করে চলেছি আমরা নিরন্তর Chaos তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে। কিভাবে এগোই আমরা? ধরে নেওয়া যাক নামজাদা সঙ্গীতজ্ঞদের বিভিন্ন গানের নমুনা নিলাম, এবারে গান মানে আমাদের কাছে একরাশ শব্দগুচ্ছ, যার গভীরে ঢুকতে হবে nonlinear পদ্ধতির সাহায্যে। এখানে কম্পাংক ব্যবহার না করেও সময়ের সাথে বায়ুকনার সরণকে নিয়ে এগোতে হবে। শব্দ আসলে বায়ুমণ্ডলের কণার চলাফেরা দিয়ে প্রকাশিত হয়। অত্যাধুনিক সফটওয়্যার দিয়ে সময়ের সাথে কণাগুলোর সরণ কীভাবে পাল্টাচ্ছে সেই তথ্য বের করা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Time series, এই time series-ই দেখায় কণাগুলোর সরণের দোলাচলতার ধরন কীরকম। সেই বিশেষ ধরনকে Chaos তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে একটা প্যারামিটার দিয়ে quantify করা যায়, এটাই হল আসল কাজ। সেই কাজে একধরনের fractal বা fractional dimension পদ্ধতির ব্যাবহার করা হয়, আমরা বলি গাণিতিক অণুবীক্ষণ পদ্ধতি, এ এমন এক জটিল অংকের খেলা, যা কিনা ভয়ানক জটিল time series-এর অন্দরে ঢুকে বের করে আনে গূঢ় তথ্য, যার ক্ষমতা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী। এই প্যারামিটারই সব সমস্যার সমাধানের মূলে। প্যারামিটারের নাম বিজ্ঞানের ভাষায় Multifractal spectral width। বারে বারে এটা ব্যবহার না করে, আমরা এর নাম দিলাম 'w', যার তাৎপর্য হল জটিলতার পরিমাপ। ধরা যাক আমাদের হাতে একটা মিটার স্কেল আছে, গানগুলোর শব্দগুচ্ছের দোলাচলতার প্রকৃতিকে মেপে দেখলাম কারো ৬০ সেমি, কারও বা ১২.৫ সেমি। ঠিক এরকমই সহজভাবে যে কোনও সঙ্গীতকে quantify করা যায় ওর শব্দগুচ্ছের দোলাচলতার পরিপ্রেক্ষিতে। গাণিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি খুব জটিল, এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে আজকের দিনে দ্রুত ওই প্যারামিটারটি নির্ণয় করা যায়। একটা উদাহরণ দিই - দু'জন শিল্পী একই গান গাইলেন – সুর, ছন্দ, শব্দ সব এক, শুধু শিল্পী দু'জন আলাদা। এবার আগে যে পদ্ধতি বলেছিলাম, সেটা ব্যবহার করে দেখা গেল, শিল্পী ১-এর জন্যে w হচ্ছে ০.৫, আর শিল্পী ২-এর জন্যে w হচ্ছে ০.৭৭। অতএব পরিষ্কার শব্দগুচ্ছকে কাজে লাগিয়ে দু'জন শিল্পীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত খবর পেয়ে গেলাম। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে শিল্পী ১-এর জন্যে কি w সবসময় ০.৫ হবে? অথবা অন্য গানের জন্যেও কি এটা ঠিক? কিম্বা এই গোটা গানটিকে আমি যদি অন্তরা, সঞ্চারী ইত্যাদি অংশে ভেঙে নি, সবই কি ০.৫ হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া যাক আস্তে আস্তে।

**চিত্রঃ প্রকৃতির বুকে হরেক fractal structure**

w আসলে কি? গানের ভিতরে শব্দগুচ্ছের যে complex structure আছে, তার ভিতরে লুকিয়ে আছে একটা অদৃশ্য symmetry বা স্বাদৃশ্য। যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছি আমরা, তার ক্ষমতা আছে এই self-symmetry বা স্ব-সাদৃশ্য কিকরে স্তরে স্তরে পাল্টায় তার খবর দেওয়ার। খুব সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল এই পদ্ধতি, তাই দক্ষ শিল্পীদের গাওয়া একই গানের

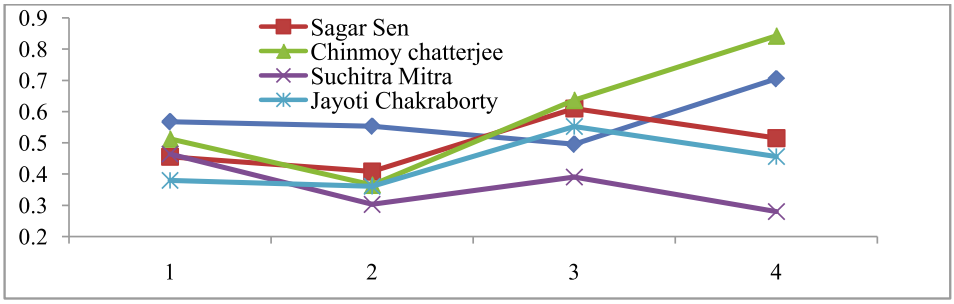


চিত্রঃ 'আমারো পরাণ যাহা চায়' গানে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জটিলতার তারতম্য

স্যাম্পেল থেকে w বের করে একটা গড় w বার করলেই বিজ্ঞান ঠিকঠাক, কারণ এটাই প্রচলিত পদ্ধতি। শব্দগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন গান শোনানো হয় নানান ব্যক্তিকে যাদের আমরা আগে বলেছি listening test। এর উত্তর থেকে গানগুলো emotion বা ভাব অনুযায়ী ভাগ করে ওই w-র সাথে মস্তিষ্কের কানাগলির একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করি আমরা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিবর্তন আর বলিউডি সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগের প্রভাব নিয়ে প্রকাশিত আমাদের দুটি গবেষণাপত্রের কাজ দিয়ে এই লেখা শেষ করবো, যদিও এই স্বল্প পরিসরে আরও অনেক গবেষণার কথাই বলা হয়ে উঠলো না, ভবিষ্যতে সময় সুযোগ পেলে সে কথা লেখা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিবর্তন নিয়ে প্রচুর আলোচনা বিতর্ক আছে - সাধারণ লোক থেকে গুণী শিল্পীদের মধ্যে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবর্তনের neurocognitive গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়, আজ যে কাজের কথা বলতে চলেছি, তা এই বিবর্তনের ধারাকে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা মাত্র। আমাদের এই গবেষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা *Entertainment Computing*-এ প্রকাশিত, এই লেখার শেষে গবেষণাপত্রটির লিংক এবং অনান্য প্রয়োজনীয় লিংক দেওয়া আছে, উৎসুক পাঠকদের সুবিধার্থে। প্রায় ১০০ বছরের সময়কাল ধরে নানান বিশিষ্ট শিল্পীদের গাওয়া কয়েকটি গান নিয়ে শুরু হয়েছিল এই গবেষণা, প্রথমে শব্দগত সংকেতের বিশ্লেষণটি। ৪টি গানের প্রত্যেকটির ২ মিনিটের clip নিয়ে চার ভাগে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক ভাগের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্যালোচনা। একটু ব্যাখ্যা করতে হবে প্রথমে। প্রথম গান ঃ 'আমার পরাণ যাহা চায়', গেয়েছেন কালানুক্রমিক ভাবে দীনেন ঠাকুর, সাগর সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র এবং জয়তী চক্রবর্তী। এবার জটিলতার পরিমাণ একটা ছবি দিয়ে বোঝানো হল, প্রত্যেক শিল্পীর জন্য আলাদা রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

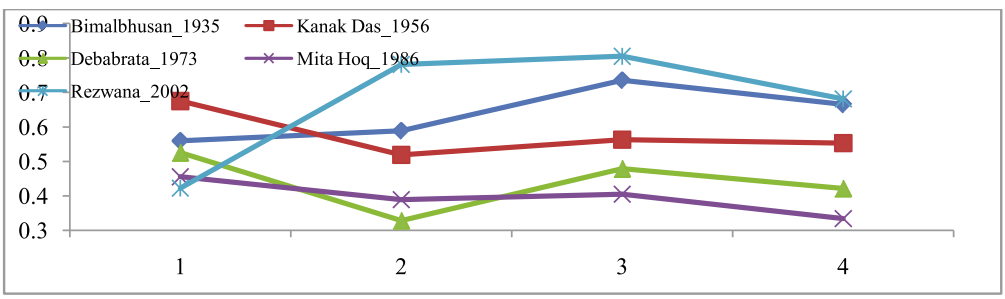


চিত্রঃ 'বহুযুগের ওপার হতে' গানে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জটিলতার তারতম্য

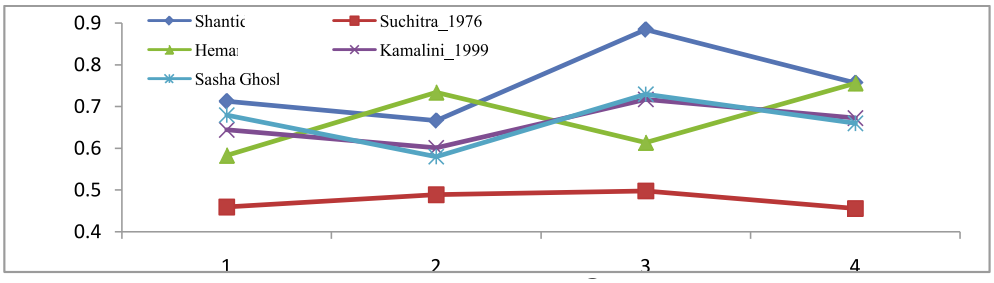


'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জটিলতার তারতম্য

অন্য গানগুলোর সময় এই বিভিন্ন সময় কালের অন্যান্য শিল্পীরাও আছেন।

ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজন্মের গাওয়া গানে বিভিন্ন খণ্ডে জটিলতার পরিমাণের যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। প্রথম দুটো খণ্ডে জটিলতার পরিমাণ অনেকটাই কাছাকাছি, এটা হয়তো ইঙ্গিত করে পরিবেশিত গানের স্টাইল একরকম, অন্যদিকে শেষ দুটো খণ্ডে এই চেহারা পরিবর্তিত হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

এরপরে 'বহুযুগের ওপার হতে' গানটি নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে। ছবি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রথম প্রজন্ম এবং চতুর্থ প্রজন্ম - এদের গানের স্টাইল একদম একরকম; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের জটিলতা অন্যদের থেকে অনেক কম। পরের গান 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', এখানে দ্বিতীয় প্রজন্মের গানের স্টাইল অন্য সব প্রজন্ম থেকে একদম আলাদা।

শেষ গান, 'মহারাজ একি সাজে', এখানে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম প্রজন্ম জটিলতার নিরিখে প্রায় কাছাকাছি; প্রথম এবং পঞ্চম প্রজন্মের জটিলতা একদম একরকম চার নম্বর খণ্ডে, এটাও দেখা গেল পাঁচটি প্রজন্মে প্রথম খণ্ডে জটিলতার দিক থেকে প্রায় এক সব ক্ষেত্রে। জটিলতার গড় নিয়ে প্রত্যেকটি প্রজন্মের ওই ৪টি গানের জন্য একটি ছবি তৈরি করা হয়েছে ।

এই ফলাফল যথেষ্ট জটিল, যার একটা সহজ সারমর্ম এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্দিষ্ট স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও আমাদের গবেষণা স্পষ্ট করে দেখায় যে শিল্পীদের গানের পরিবেশনে বৈজ্ঞানিক জটিলতার পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য, এমনকি একই প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। এটা অবশ্যই তাৎক্ষনিক সৃষ্টিশীলতার একটি ইঙ্গিত বহন করে। আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফলাফল হল - প্রথম প্রজন্মের সাথে পঞ্চম প্রজন্মের গায়কী অনেকটাই এক ধরনের, হয়তো ভাবের প্রকাশে

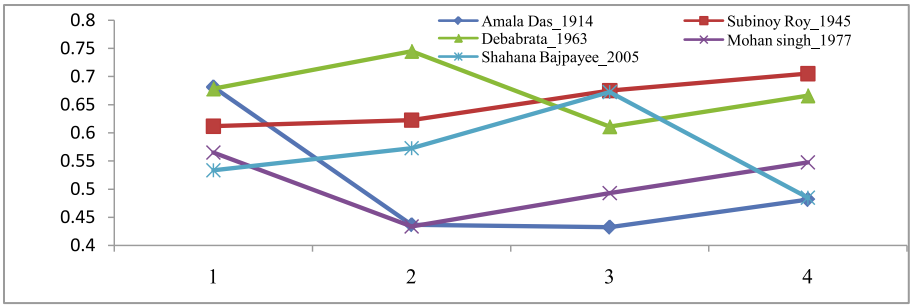


'মহারাজ একি সাজে' গানে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জটিলতার তারতম্য

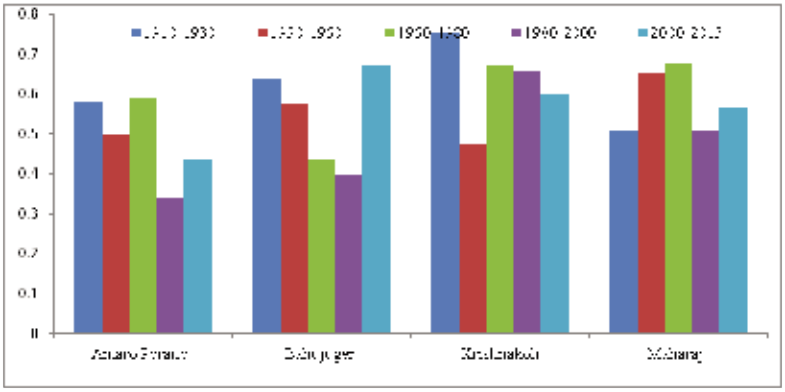

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে জটিলতার তারতম্য

মনযোগী হয়েছিলেন ওই দুই প্রজন্মের শিল্পীরা। এই গবেষণার আরেকটি অঙ্গ ছিল মস্তিষ্কে এই ক্রমশ বিবর্তিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব, কিন্তু এই পর্বে মূলত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব সঙ্গীতের শব্দগুচ্ছের বিশ্লেষণের ওপরে। এই অংশের শেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা অবশ্য প্রয়োজন, একই সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ অনেক রাগ ব্যবহার করলেও যে কোনও রাগের কোনও একটা নিয়মিত note-কে ব্যবহার না করে অন্য note-এর প্রয়োগই গানটিকে আরও অনেক নান্দনিক করেছে। এর উদাহরণ অজস্র এবং এদের বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে করার ইচ্ছে আছে আমাদের।

রস সঞ্চারের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা নিয়ে আরেকটি গবেষণার কথা বলে শেষ করব। আমরা সবাই জানি ৬০ থেকে ৮০-র দশকের বলিউডি চলচ্চিত্রের অধিকাংশ গানই রাগ-নির্ভর। আমাদের গবেষণা হবে এইসব গানগুলোর মূলে কোন কোন রাগ আছে এবং তাদের রসের অস্পষ্টতা কতোটা আর তার কারণটাই বা কি, সেইটে খোঁজা। দুটো জনপ্রিয় রাগ - ভৈরব (ভোরের রাগ), আরেকটি মিয়াঁ কি মলহার (বিশেষ ঋতুর রাগ) বাছা হল, এর সাথে ৬০ থেকে ৮০-র দশকের খুব জনপ্রিয় ১০টি গান, বিখ্যাত শিল্পীদের গাওয়া, বাছা হল। সেগুলোর বিবরণ নীচের টেবিলে দেওয়া হল।

| Clip No. | Song Name | Singer | Film (Year) |
|---|---|---|---|
| Clip 1 | Mohabbat Ki Jhooti Kahani | Lata Mangeshkar | Mughal - E - Azam (1960) |
| Clip 2 | Karo Sab Nichchawr | Asha Bhosle | Ladki Sayadri Ki (1966) |
| Clip 3 | Mohe Bhul Gaye Sanvariya | Lata Mangeshkar | Baiju Bawra (1952) |
| Clip 4 | Naach Mere Mor Zara Naach | Manna Dey | Tere Dwar Khada Bhagwan (1964) |
| Clip 5 | Dil Diya Dard Liya | Md. Rafi | Dil Diya Dard Liya (1966) |
| Clip 6 | Na-Na-Na Barso Badal | Lata Mangeshkar | Prithviraj Chauhan (1959) |
| Clip 7 | Ek Ritu Aaye Ek Ritu | Kishore Kumar | Gautam Govinda (1979) |
| Clip 8 | Duniya Bananewale | Manna Dey | Ziddi (1964) |
| Clip 9 | Insaan Bano | Naushad | Baiju Bawra (1952) |
| Clip 10 | Amma Roti De | Lata Mangeshkar | Sansaar (1952) |

টেবিলঃ হরেক বলিউডি গান, সঙ্গীত শিল্পী এবং সিনেমা রিলিজের বছর, এগুলো নিয়েই আমাদের গবেষণা

এবার দেখার চেষ্টা ওই প্রত্যেকটা গানের ভিত্তি কোন রাগ এবং সেই রাগে রসের অস্পষ্টতা কতোটা। রাগগুলোর আলাপ অংশের নিরিখে একেকটা clip বাছা হল, শব্দগুচ্ছের সংকেত ব্যবহার করে এই বিশ্লেষণ। এখানে রাগের সাথে বলিউডের গানের আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য কাজে লাগানো হবে cross correlation coefficient বা আন্তঃসম্পর্ক গুণাঙ্ক, বৈজ্ঞানিক নাম MFDXA ($\gamma$)। $\gamma$-র মান যতো কম হবে সম্পর্ক হবে ততোটাই জোরালো। প্রত্যেকটি clip-এর সাথে রাগের সম্পর্ক $\gamma$-র নিরিখে নীচের ছবিগুলো দিয়ে বোঝানো হল ঃ

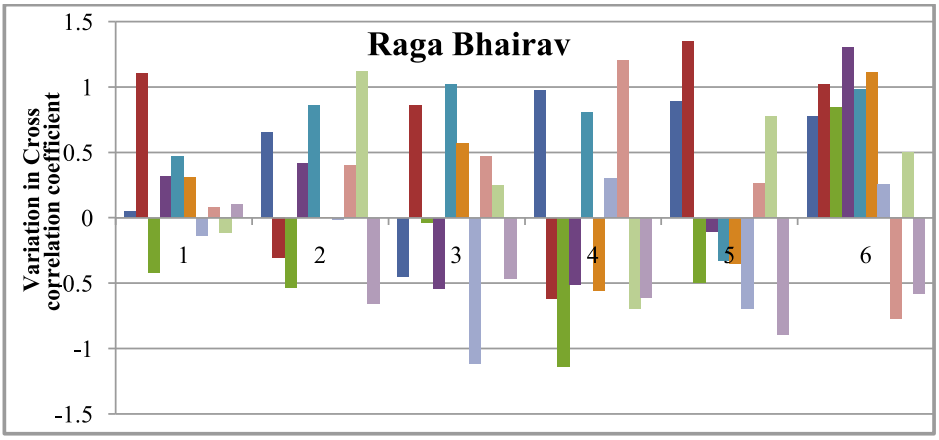


প্রথম শিল্পীর জন্য γx-এর পরিবর্তন

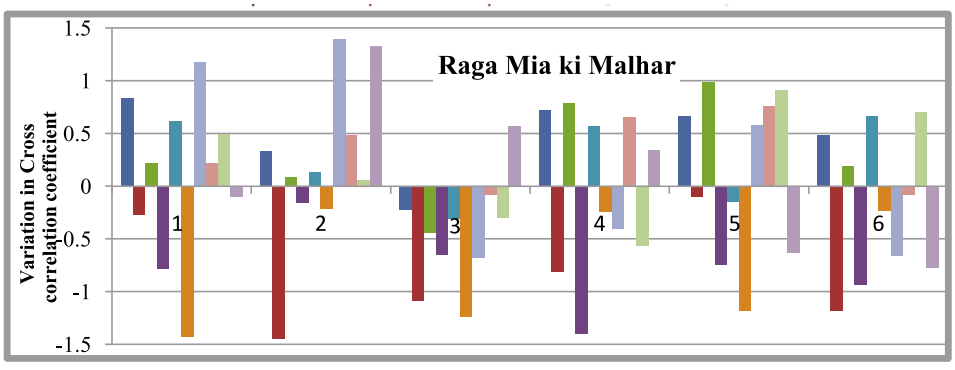


প্রথম শিল্পীর জন্য $\gamma_x$-এর পরিবর্তন

যেসব ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্কের গুণাঙ্কের মান সবচেয়ে কম সেই ফলাফলও আরেকটি টেবিল দিয়ে বোঝানো হল।

| | Raga Bhairav | | Raga Mia ki Malhar | |
|---|---|---|---|---|
| | Artist 1 | Artist 2 | Artist 1 | Artist 2 |
| Clip 1 | -0.44 | -0.35 | -0.22 | -0.66 |
| Clip 2 | -0.61 | -0.7 | -1.45 | -0.817 |
| Clip 3 | -1.13 | -1.08 | -0.44 | -0.28 |
| Clip 4 | -0.53 | -0.7 | -1.39 | -1.04 |
| Clip 5 | -0.32 | -0.53 | -0.3 | -0.58 |
| Clip 6 | -0.34 | -0.56 | -1.43 | -1.75 |
| Clip 7 | -1.11 | -0.89 | -0.67 | -0.28 |
| Clip 8 | -0.7 | -0.17 | -0.08 | -0.64 |
| Clip 9 | -0.11 | -0.34 | -0.56 | -0.14 |
| Clip 10 | -0.89 | -1.37 | -0.77 | -0.288 |

চিত্রঃ আন্তঃসম্পর্কের গুণাঙ্কের সর্বনিম্ন মান প্রত্যেক শিল্পীর জন্যে

শুধুমাত্র শুনেই একটা চলচ্চিত্রের গানের পিছনে কী রাগ আছে বোঝা খুব মুশকিল, কিন্তু আন্তঃসম্পর্ক গুণাঙ্ক সহজেই রাগের সাথে গানের সম্পর্কের পরিমাণ সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এর ফলে একটা ন্যূনতম threshold ঠিক করা যেতেই পারে যেটা বলে দেবে, যে কোনও একটি গান একটি না একাধিক রসের মিশ্রণ, আমাদের গবেষণায় এই গুণাঙ্কের মান পেয়েছি -০.৮, যার নীচে যে কোনও গানে একটি রাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এভাবে চলচ্চিত্রের গানে রাগ সঙ্গীতের প্রয়োগ আরও ইচ্ছেমতো ব্যাপকভাবে করে গানকে অধিকতর রসোত্তীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

শেষ করব এই বলে, ২০১২-১৩ সাল নাগাদ এই ধরনের কাজ যখন শুরু করেছিলাম আমাদের গবেষণাগারে, তখন ভারতীয় আধুনিক সঙ্গীতের বিশ্লেষণ এবং মস্তিষ্কে তাঁর প্রভাব, বিজ্ঞানের আধুনিকতম পদ্ধতির সাহায্যে, এই ভাবনাটাই ছিল অলীক কল্পনার মতো, প্রায় ১০ বছর নিরলস পরিশ্রম এবং প্রায় শতাধিক গবেষণাপত্রের প্রকাশনার পরে এখন এই সম্বন্ধে জনমানসে আস্তে আস্তে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ভারতবর্ষের হরেক প্রান্তে এই নিয়ে ছোট ছোট নানান দল নিজেদের মতো করে গবেষণা শুরু করেছে। আমাদের তো এটুকুই স্বপ্ন ছিল, আস্তে আস্তে তা পরিণতি পাচ্ছে এ এক পরম তৃপ্তির বিষয়।

**তথ্যসূত্রঃ**


Sanyal, S., Banerjee, A., Nag, S., Sarkar, U., Roy, S., Sengupta, R., & Ghosh, D. (2021). 'Tagore and neuroscience: A non-linear multifractal study to encapsulate the evolution of Tagore songs over a century'. *Entertainment Computing*, *37*, 100367.

Sanyal, S., Banerjee, A., Roy, S., Nag, S., Sengupta, R., & Ghosh, D. (2021). 'Ragas in Bollywood music—A microscopic view through multrifractal cross-correlation method'. *The Journal of Acoustical Society of India (ISSN: 0973-3302) 48 (1-2), 2021, 91-97*

Ghosh, D., Sengupta, R., Sanyal, S., & Banerjee, A. (2018). *Musicality of human brain through fractal analytics*. Springer Singapore.

# গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি

**তপতী মুখোপাধ্যায়**
**গ্রন্থাগার সচিব, দি এশিয়াটিক সোসাইটি**

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র একশো সাতান্নটি রচনার মধ্যে গানের সংখ্যা ছিয়াশি অর্থাৎ "রবিচ্ছায়া" বা "গান" এর মতো সম্পূর্ণ গীতিসংকলন না হলেও গানকে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-তে প্রাধান্য দিয়েছেন সুরের সুরধুনীতে জীবনদেবতাকে উপলব্ধির প্রয়াসে। গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই প্রীতিপক্ষপাত ফুটে উঠেছে তাঁর অজস্র লেখায়—"আমি যখন গান বাঁধি, তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই, প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এসবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম—

'যবে কাজ করি, প্রভু দেয় মোরে দান
যবে গান করি, ভালোবাসে ভগবান।।'

গান রবীন্দ্রনাথের প্রাণের আরাম, তাই গানের আবহে গড়ে তুলেছেন 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিমা। "সংগীত ও কবিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সংগীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখি।.... কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।"

একান্ত অন্তর্গূঢ় গভীর যে ভাবকে কথা দিয়ে ছোঁওয়া বা প্রকাশ করা যায় না সেই অনির্বচনীয় অপ্রকাশিতের প্রকাশ ঘটে গীতরসনির্ঝরে। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ তাই সুরকে অবলম্বন করেছে তার গভীর গোপনকে প্রকাশের অভীপ্সায়, ভারতীয় সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে সংগীতমনস্কতা ও সংগীতপ্রীতি প্রবাহিনী নদীর মতোই স্বতশ্চলা। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমরস নিষ্কাশনের সময় সংগীতপরা নারীদের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট যে ভারতবর্ষ চিরদিনই সুরসাধনা করে এসেছে।

"সমু ত্বা ধীভিরস্বরন্ হিন্বতীঃ সপ্তজাময়ঃ।
বিপ্রমাজা বিবস্বতঃ।।"

(ঋগ্বেদ ৯/৬৬/৮)

গানের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নৃত্যও যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনের অঙ্গ ছিল তার প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদে যেখানে ঊষা নর্তকীর মতো রূপ প্রকাশ করছেন বলে ঋষি কবির মুগ্ধ স্তুতি রণিত হয়েছে—

"অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্নুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
(ঋগ্বেদ ১/৯২/৪)

কৃষ্ণযজুর্বেদে (৬/১৬) মেয়েরা সংগীতজ্ঞ পতি প্রার্থনা করছে---এমন উল্লেখ আছে। তবে প্রাচীন ভারতীয়

সংগীতলহরীর আদি উৎস সামবেদ যেখানে ঋগ্বেদের মন্ত্রে সুরারোপ করা হয়েছে যজ্ঞে গাওয়ার জন্য। উদ্‌গাতা নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল সামগানের দায়িত্ব। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রনির্মিতিতে সংগীতের উৎসরূপে সামবেদের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

"জগ্রাহ বাচং ঋগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি।।"

(নাট্যশাস্ত্র ১/১৭)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংগীতের আরো একটি উপাদান বা অঙ্গী বাদ্য প্রায় সব যজ্ঞেরই অংশ ছিল। অশ্বমেধযজ্ঞে বীণা বাদনরত ব্রাহ্মণ বা রাজন্যের উল্লেখ রয়েছে। পুরুষমেধযজ্ঞে বীণাবাদনসহ সংগীত ও নৃত্যপ্রয়োগও প্রাচীন ভারতে সংগীতচর্চা ও সংগীতমনস্কতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেদজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য যে ছয়টি বেদাঙ্গ তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা বেদাঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য বই 'নারদীয় শিক্ষা' যা বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির উচ্চারণ ও সাংগীতিক রূপ নিয়ে আলোচনা করেছে। সাতটি বৈদিক স্বরকে চিহ্নিত করেছেন নারদ—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ক্রুষ্ট ও অতিস্বর।

পরবর্তীতে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ) নৃত্য, গীত ও বাদ্য নাট্যের অংশরূপে বর্ণিত হয়েছে। গান বাদ্যসহ বা বাদ্যবর্জিত যেমন হতে পারে তেমনি একক বা দ্বৈত সংগীতেও তার স্ফূর্তি লক্ষণীয়। নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যখন অভিনেয় বস্তু গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তখন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ অনুচিত।

"যত্রাভিনেয়ং গীতং স্যাৎ তত্র বাদ্যং ন যোজয়েৎ।"

(৪/২৮১)

সংগীতপরা নর্তকী ও অন্যান্য নারীরা মঞ্চে প্রবেশ করবেন ও গীত সমাপনান্তে নিষ্ক্রান্ত হবেন—

"প্রযুজ্য গীতমেবং তু নিষ্ক্রামেন্নর্তকী ততঃ।
অনেনৈব বিধানেন প্রবিশন্ত্যপরাঃ পুনঃ।।

(৪/২৮৩)

ছন্দক গীতিবিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রথমে গানে সমগ্র বিষয় অভিনীত হবে, পরে ঐগুলি নৃত্যের দ্বারা প্রদর্শিত হবে—

"প্রথমং ত্বভিনেয়ং তু গীতকে সর্ববস্তু তৎ।
তদেব চ পুনর্বস্তু নৃত্যেনাপি প্রদর্শয়েৎ।"

(৪/২৯৯)

যখন একটি গানে এর কয়েকটি অংশ পুনরাবৃত্ত হয় তখন প্রথমে উচ্চারিত অংশগুলি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শনীয় এবং অবশিষ্ট অংশগুলি নৃত্যে রূপায়িত হবে—

"যদা গীতবশাদঙ্গং ভূয়ো ভূয়ো নিবর্ততে।
তত্রাদ্যমভিনেয়ং স্যাৎ শেষং নৃত্যেন যোজয়েৎ।"

(৪/৩০৪)

সপ্তস্বরের কথা বলেছেন ভরত—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। এরপর ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের আরেকটি আকরগ্রন্থ যেখানে সংগীতকে নৃত্য, বাদ্য ও গীতের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ উপস্থাপনা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সংগীতের দুটি বিভাগ মার্গসংগীত ও দেশীসংগীত। মার্গসংগীত নাট্যশাস্ত্রানুসারী উচ্চাঙ্গবিধির বিপ্রতীপভাবে দেশী সংগীত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মস্থ করে একটি নিজস্ব সাংগীতিক ধারা গড়ে তুলেছে।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে শ্রীশুভংকরের "সংগীতদামোদর" নিজগুণে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই রচনাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলেও বহুকাল যাবৎ এর মূল পুঁথিটি পাওয়া যায় নি। অবশেষে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের পুঁথিসংগ্রহ থেকে বইটির দুটি পুঁথি ও লন্ডনের India Office Library ও প্যারিসের Bibliotheque থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য দুটি পুঁথির পাঠ ও পর্যালোচনার (collation) মাধ্যমে 'সংগীতদামোদর' রচনাটির একটি গ্রহণযোগ্য পাঠ নির্মাণ করেন আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৯৬০ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদসহ মূল বইটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে ২০০৯ সালে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'সংগীত দামোদর' রচয়িতা শ্রীশুভংকর বাঙালী ও পরম বৈষ্ণব রূপে কীর্তিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগীত সমাজে তাঁর বইটি বহু ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত।

বইয়ের সূচনায় শুভংকর জানিয়েছেন যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে সার আহরণ করে যা কিছু সংগীত শাস্ত্রে রসাপ্লুত তার সমাবেশে তিনি 'সংগীত দামোদর' রচনা করেছেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা তাঁর মুখ্য উপজীব্য—

"যদ্ যচ্চ সারং ভরতোদিতেষু তত্তৎ সমাকৃষ্য রসাংকুরাভম্।
শুভংকরঃ সম্বৃতমাদরেণ সংগীতদামোদরমাতনোতি।।"

(১/৫)

.... পিপাসবঃ কেশবকেলিরংগ সংগীতদামোদররসমাদ্রিয়ধ্বম্।"

(১/৬)

লক্ষণীয় যে 'সংগীত দামোদর' নাম হলেও নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে এখানে বিভিন্ন ভাব, নায়ক- নায়িকা, নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক, দৃশ্যকাব্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ যথা প্রকরণ, ব্যায়োগ ইত্যাদির লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে।

বইয়ের শুরুতে গ্রন্থকার ভাবের সর্বতো পরিব্যাপিতা উল্লেখ করেছেন। ভাব ছাড়া কাব্য, রস, নৃত্য কোনটাই পূর্ণাঙ্গ হয় না অর্থাৎ ভাবই মুখ্য।

"কাব্যং ন ভাবেন বিনা ন ভাবেন বিনা রসঃ।
ন ভাবেন বিনা নৃত্যং ন ভাবেন বিনা জগৎ।।"

(১/৮)

সাত্বিক ভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন 'হাব' এর যা নারীর প্রেমাবেশে মুগ্ধ পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করে। হাবের সংখ্যা চোদ্দ।

"যুবানোহনেন হূয়ন্তে নারীভির্মদনানলে।
অতো নিরুচ্যতে হাবাস্তে তু হাবাশ্চর্তুদশ।।"

(১/২৩)

নায়ক-নায়িকা প্রসঙ্গ আলোচনার পর শুভংকর আবার সংগীত প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন, অবতারণা করেছেন 'নাদ' এর উৎপত্তি সূত্রের। নাভির ঊর্ধ্বে হৃদয়স্থান থেকে উদ্ভূত বায়ু—যার আরেক নাম প্রাণ, সে যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে আঘাত করে তখন তার সৃষ্ট শব্দের নাম নাদ।

"নাভেরূর্ধং হৃদিস্থানান্মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্তিতঃ।।

(২/৫১)

নাদ তিন প্রকার— শরীর থেকে উদ্ভূত, দ্বিতীয়টি বীণা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপন্ন, তৃতীয়টি বাঁশীর সুরে ভেসে ওঠে। অখিল জ্ঞান ও সংগীতের উৎস হল নাদ এবং স্বয়ং হরিও নাদরূপ।

" ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
না রাগেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ।।
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ।"

(২/৫৬-৫৭)

গানের সৃষ্টি প্রসঙ্গে শুভংকর বলেছেন যে ধাতু ও মাতুর মিলনে গানের জন্ম। ধাতু হল নাদাত্মক আর মাতু হল অক্ষরসমষ্টি।

"ধাতুমাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাতুরক্ষরসঞ্চয়ঃ।।

(২/৫৮)

গানের আবার দুটি ভেদ—বাঁশীবীণা ইত্যাদি যন্ত্রসমুদ্ভব একটি, দ্বিতীয়টি মুখে গাওয়া হয়। নিবদ্ধ-অনিবদ্ধ ভেদে গান দুই প্রকার—অনিবদ্ধ গীতের ক্ষেত্রে বর্ণ নিয়ম ততো কঠোর নয়। তবে নিবদ্ধ গীত তাল-মান-রসযুক্ত হবে এবং ছন্দ, বর্ণ ইত্যাদির নিয়মে নিয়মিত হবে।

"নিবদ্ধঞ্চ ভবেদ্ গীতং তালমানরসান্বিতম্।
ছন্দোগমকধাত্বঙ্গবর্ণাদিনিয়মৈঃ কৃতম্।।"

(২/৬১)

সংগীত শব্দের উৎসও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—রংগমঞ্চে নৃত্যকে অনুসরণ করে বলে এর নাম সংগীত এবং সংগীতে যে চিত্তের স্ফুর্তি অনুভব করে না সে নিতান্তই অভাগা।

"নৃত্যস্যানুগতং রংগে তৎ সংগীতকমুচ্যতে।
.... সংগীতকেন রম্যেন সুখং যস্য ন চেতসি।
.... বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ।।"

(২/৬৩-৬৪)

জনচিত্তহারী এবং দুঃখমুক্তির কারণস্বরূপ যে গীত তার মহিমাকীর্তনে রচয়িতা শুভংকর অকুণ্ঠ—

"সকলজনচিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং পরং গীতম্।"

(২/৭০)

শুদ্ধ, শালগ ও সংকীর্ণ ভেদে গীত তিন প্রকার। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন লেখক—দেশীয় সংগীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো নিয়মকানুনের কঠোরতা ততটা মান্য নয় অর্থাৎ পুনরুক্তি, সন্ধির নিয়মভঙ্গ ইত্যাদি আপাত ত্রুটিও মার্জনীয়।

ধ্রুবক লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ধ্রুবকের গুরুত্ব উচ্চারিত হয়েছে লেখকের কণ্ঠে—ধ্রুবক ব্যতীত গান হয় না—"ন গানং ধ্রুবকং বিনা" (২/৮৫)। ধ্রুবকের প্রথম নাদ অর্থাৎ অংশ হল উদ্‌গ্রাহ বা ভূমিকাংশ—পূর্বসূরিদের এই মত উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন যে ধ্রুবকে অর্থাৎ মধ্যভাগে ঐ পূর্বাংশটিকে রক্ষা করেই গান করা হয়।

"গীত্বা পূর্বপদন্যাসো যত্র স ধ্রুবকো মতঃ।।"

(২/৯০)

তৃতীয় স্তবকে স্বর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন লেখক স্বরের—মনোমুগ্ধকর যা শ্রবণমাধ্যমে প্রসারিত হয় তাই স্বর।

"স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বরন্ হৃদয়রঞ্জকঃ।"

(৩/১)

ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সাতটি স্বরের উল্লেখ করে এদের প্রত্যেকের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন গ্রন্থকার। স্বরের বিস্তার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ক্রমানুসারে অর্থাৎ আরোহণ অবরোহণ ক্রমে স্বরগুলির সজ্জা বা বিন্যাস ঘটবে। নিজস্ব শ্রুতিস্থান বজায় রেখে অন্য শ্রুতি আশ্রয় করে স্বরের যে পরিণতি তাকে বলে মূর্ছনা। মূর্ছনাপ্রাপ্ত স্বরকে বলে গমক।

"স্বশ্রুতিস্থানসম্পন্নচ্ছায়াং শ্রুত্যন্তরাশ্রয়াম্।
স্বরো যো মূর্ছনামেতি গমকঃ স ইহোচ্যতে।।"

(৩/১৫)

সপ্তস্বরসমুদ্ভব হচ্ছে তান যার মাধ্যমে মূর্ছনাকে শ্লিষ্ট করে সঙ্গীতের প্রয়োগ বিস্তারিত হয়। (৩/৩৫)

ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার—এই তিনটিকে গ্রাম বলা হয়। নিখিলচিত্তহারী এই যে রাগ তার সংখ্যা ষোল হাজার। তার মধ্যে ছত্রিশটি রাগের প্রাধান্য স্বীকৃত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাগের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। মতান্তরে ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রান্তে এই সমস্ত রাগের প্রচার আছে বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীশুভংকরের মতে ভৈরব, বসন্ত, মালবকৌশিক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ, নটনারায়ণ এই ছয়টি রাগ বহুল প্রচলিত আর রাগিনী ত্রিশটি। এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে যখন তিনি বলেন যে ভারতের সর্বত্র, পূর্বে-পশ্চিমে, এমন কি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপগুলিতেও এই রাগগুলি প্রচারিত।

"মেরোরুত্তরতঃ পূর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে তথা।
সমুদ্রকাশ্চ যে দেশাস্তত্রামীষাং প্রচারণা।"

(৩/৫৪)

প্রাচীন সংগীতজ্ঞদের মতানুসারে বাইশটি শ্রুতির কথা বলেছেন লেখক এই বইয়ের চতুর্থ স্তবকে।

পঞ্চম স্তবকের সূচনায় গায়কের গায়নদোষগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিস্বর, বিরস, সানুনাসিক ইত্যাদি গায়নদোষ চতুর্দশ প্রকার বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্থায়ী, সঞ্চারী, আহারী, কাপালিনী—চার প্রকার অলতির কথা বলা হয়েছে। লয় প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে তিনটি লয়—যাদের স্থিতি হৃদয়ে, কণ্ঠে ও কপালে।

গ্রন্থের নাম অনুযায়ী সংগীত বিষয়ক হলেও 'সংগীতদামোদর' নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। রস ও ভাব স্বতন্ত্র হলেও পরস্পরসিদ্ধির জন্য উভয়ের ভূমিকা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ভাব ও রসের পরস্পর সম্পৃক্ততা উচ্চারিত হয়েছে—

"ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগাদ্ যথান্নং ভাবকং ভবেৎ।
এবং ভাবরসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্।"

(৫/১৫)

নব রসের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। এক কথায় সংগীতের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক— উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবান আলোচনা এই বইটির সম্পদ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়। ভারতীয় সংগীত বিষয়ক অধিকাংশ বইয়ে সংগীত আলোচনার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে রয়েছে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা। ভাব ও রস, ভাবের রসে পরিণতি, রসের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রতিটি বইকে সমৃদ্ধ করেছে। শুভংকরের "সঙ্গীত দামোদর"ও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গে আরো একটি বই উল্লেখের দাবী রাখে। সেটি হল চতুরদামোদরবিরচিত "সংগীত দর্পণ"। বইয়ের সূচনায় লেখক হরিভট্ট রূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন—

"শ্রীমতা হরিভট্টেন সজ্জনানন্দহেতুনা।
প্রচদ্রূপসঙ্গীতসারোদ্ধারো বিধীয়তে।।"

(স্বরাধ্যায় ১/২)

গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিনটির সামূহিক রূপ সংগীত—এই উক্তির মধ্য দিয়ে সংগীতের ব্যাপ্তি যেমন নির্দেশিত হয়েছে তেমনি উচ্চাঙ্গ ও স্থানীয় ভেদে সংগীতের দুটি প্রকার চিহ্নিত করা হয়েছে—

"গীতং বাদ্যং নর্তনং চ ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।
মার্গদেশীবিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্।।"

(১/৩)

তাল লয় নিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনপ্রিয় লোকগীতও যে সংগীতের অপরিহার্য অংশ—এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতিটি লোকগানের পক্ষে জরুরি ছিল।

"তত্তদ্দেশস্থয়া রীত্যা যৎ স্যাল্লোকানুরঞ্জকম্।
দেশে দেশে তু সংগীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।"

(১/৫)

নাদ, গ্রাম, তাল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে রাগরাগিনী, প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা এই বইয়ের গৌরব বাড়িয়েছে। রাগরাগিনীর আলোচনায় 'বঙ্গালী' নামে একটি রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন রাগের উপযোগী ঋতু ও সময়ও আলোচিত হয়েছে। যথা বর্ষায় মেঘ রাগের গান উপযুক্ত বলা হয়েছে।

"মেঘরাগো রাগিণীভিঃ যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।।"

(প্রকীর্ণক/১৮২)

ভারতীয় সংগীতের প্রবাহিনী ধারায় পরিশীলিত শাস্ত্র-নিয়মিত মার্গসংগীতে এসে মিশেছে আঞ্চলিক সংগীতের সুরমাধুরী। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতগুরুরা এখানে কোন ভেদাভেদ করেন নি, নাটকের মতোই সংগীত হয়ে উঠেছে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে নির্মিত দুঃখীজনশরণ, 'বিশ্রান্তিজনন' এক উত্তরণ। আর রবীন্দ্রনাথে এসে গান হয়ে উঠেছে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধির সেতু—

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
... রয়েছ তুমি, এ কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।।"

**সূত্রনির্দেশ ঃ**


১ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০।

২ শুভংকর, সংগীত দামোদর, ed গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৬০।

৩ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, অনূদিত সংগীতদামোদর, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৯।

৪ K. Vasudeva Sastri ed Sangita Darpanam of Catura Damodara, S. Gopalan, Saraswathi Mahal, Tanjore, 1952.

৫ Tapati Mukhopadhyay ed Rabindranath Tagore, বৈভবে ও বৈচিত্র্যে গীতাঞ্জলি Glimpses of Gitanjali, Visva-Bharati, Santiniketan, 2017।

প্রতিদিন ছুটি
রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

# না, যেও না

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
indrani.bhattacharya5@gmail.com

লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে বাংলা গানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কত যে অবিস্মরণীয় গান তিনি গেয়েছেন বাংলা ভাষায়, বাঙালিদের জন্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলতেন 'অ্যাপ্লিকেশন'। নতুন কোনও ভাষায় গাইতে হলে এই অ্যাপ্লিকেশন' শুরু হত উচ্চারণ, শব্দের অর্থ, কাব্যগুণ, ভাব, স্বরভঙ্গি, সুর ও লয়ের চর্চায়। এসব মিলিয়ে একটা গানের ছবি-ই যেন গড়ে নিতেন লতাজি।

১৯৫৩ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় দু'টি রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে লতা মঙ্গেশকরের বাংলা গানে আসা। গান দুটো 'তোমার হল শুরু' আর 'মধু গন্ধে ভরা।'

স্কুলে পাঠ্যরত বালক-বালিকা আমরা তখন হেমন্তর 'রানার', 'পালকির গান' আর মহিলা কণ্ঠের দু'টি গান 'মধু গন্ধে ভরা' আর 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'-র মধ্যে নিত্যদিন দোল খাচ্ছি। আমাদের খবরও নেই যে, মেয়ের কণ্ঠের একটা গান অ-বাঙালি লতার, যাঁর 'আয়েগা আনেওয়ালা' আর 'ইয়ে জিন্দেগি উসি কি হ্যায়' খুব গুনগুনাতে দেখি দিদিদের আর ওদের বান্ধবীদের। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' যে সন্ধ্যার গান তা জানার পরও 'মধু গন্ধে ভরা'-র সঙ্গে লতাকে মেলাতে পারিনি আরও কিছুদিন, যেটা ঘটল সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে শিল্পীর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' গানটির রেকর্ডটি বাড়িতে আসতে। দেখতে দেখতে, পাঁচের দশকের শেষদিকে হেমন্ত-ধনঞ্জয়-শ্যামল বা হেমন্ত-মান্না-মানবের মতো নারীকণ্ঠেরও এক অপূর্ব ত্রয়ী তৈরি হয়ে গিয়েছে বাংলায়: লতা-গীতা-সন্ধ্যা। শনি আর রবিবারের 'অনুরোধের আসর'-এ কোনও একদিন শেষ মহিলা-কণ্ঠ যদি হন সন্ধ্যা, তো অন্যদিনে লতা। রবীন্দ্রসংগীতে সুচিত্রা-কণিকার মতো বাংলা আধুনিকের কীর্তিময়ী জুটি ততদিনে সন্ধ্যা-লতা। নিয়তির খেলা এমনই যে বাঙালি সমাজ যখন ঘোর উদ্বেগে হাসপাতালে শয্যাশায়ী সন্ধ্যার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে, তখনই সেই প্রেম-দ্বন্দ্বের জুটি ভেঙে দূরের তারার দেশে চলে গেলেন লতা। বিখ্যাত নাটকের সংলাপে বলতে গেলে 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা।'

হিন্দি গানের লতা আর বাংলা গানের লতা যে এক-ই-জন তা নিয়ে আমাদের বাল্যকালের ধন্দের একটাই কারণ— গানে লতার নিখুঁত বাংলা। দেশের ৩৫-৩৬টা ভাষায় গান গেয়েছেন শিল্পী; নানা ভাষাভাষীর কাছে শুনেছি তাঁদের ভাষাতেও ওঁর উচ্চারণ, টোন, ভাব বা পেশকারিতে এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি কখনও।

হেমন্তদাকে জিজ্ঞেস করায় শুধু একটা শব্দে এর উত্তর দিয়েছিলেন: 'অ্যাপ্লিকেশন'। একবার নতুন কোনও ভাষায় গাইতে হলে এই অ্যাপ্লিকেশন শুরু হত উচ্চারণ, শব্দের অর্থ, কাব্যগুণ, ভাব, স্বরভঙ্গি, সুর ও লয়ের চর্চায়। এসব মিলিয়ে একটা গানের ছবি-ই যেন গড়ে নিতেন। একবার লতা প্রসঙ্গে কথায় কথায় হেমন্তদা বললেন, 'আপনি লক্ষ করবেন ওর গলায় প্রচুর কাজ আছে। কিন্তু যখন-তখন তা দেয় না। আর দিলে কীভাবে দেয়। কথাকে এতটুকু নষ্ট করে না। এই ঠিক জায়গায় দিয়ে দেয়, এই ছোট্ট করে। যেখানে দেওয়া উচিত, আর যতটুকু।'

প্রথমবার লতাকে রবীন্দ্রসংগীতের ট্রেনিং দিতে গিয়ে হেমন্তদা এটা ধরতে পেরেছিলেন। আর, হেমন্তদার এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম সতীনাথদার কথায়, যখন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছি 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে' গানটা নিয়ে। প্রশ্ন ছিল, এত সেনসিটিভ, নির্জন রাতের ছবির মতো গান লতাকে দিয়ে গাওয়ানোর কথা মাথায় এল কেন? কথা হচ্ছিল কেয়াতলার সেই বাড়িতে, পাশের সোফায় উৎপলাদি। প্রায় হেমন্ত-স্টাইলে সতীনাথদা উত্তর করলেন: 'পারফেকশন'। তারপর ব্যাখ্যা দিলেন, 'কথাগুলো খেয়াল করো। প্রথমে আকাশপ্রদীপ, যা রাতের আকাশে ভাসছে। আর সে চেয়ে আছে আরও অঢেল উঁচুতে দূরের তারার পানে। অর্থাৎ, লতার ওই গলা একটা লেভেলে গানটা ধরে খেলতে খেলতে আরও উপরে চলে যাবে। তারপর নেমে আসবে মাটির স্তরে নায়িকা-গায়িকার চোখের কাছে। যা ব্যথার বাদলে ভাসছে। সবচেয়ে বড় কথা পুরো গানটায় একটা রাতের নির্জনতা আছে, যেটা সুর করার সময় মাথায় রেখেছিলাম আর লতার রেন্ডারিংয়ে সুন্দর এসেছে। ফলে শুধু হিট নয়, একটা থেকে যাওয়ার মতো গান হল।'

লতাজির দেহাবসানে এই কথাগুলোই মাথায় ঘুরছিল। মনে পড়ল আমার প্রশ্নের উত্তরে বলা হেমন্তদার কথাগুলো। বলেছিলেন, 'তবে লতার একটা জিনিস আছে, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যেটা আসতে দেখেছি— মানুষের গলা কী হয়, যত উপরের দিকে যায় তত চেপে যায় তো? কিন্তু ওর গলা যতই চড়ায় ওঠে, ততই খুলে যায় এইরকমভাবে।'

হেমন্তদা এই সময় দু'-হাত ছড়িয়ে গলার বেধ বোঝালেন। তারপর বললেন, 'আপনি হয়তো কাছেই বসে শুনছেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না। কী করে আসছে, কী করে চড়ায় ওরকম গলা খুলছে গ্লু মাইক্রোফোন? সেই উপরে গিয়েই দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু এতখানি গলা চলে আসছে। একটা রেঞ্জের উপর গিয়ে লোককে তো গলা চাপতেই হয়, ওখানে গিয়ে গলা একটু-একটু নেমে আসে। এটা আমার মধ্যেও আছে। আমারও বেশ খোলা, যেমনি উপরে, তেমন নিচে। লতার এটা আরও সুন্দর।'

লতা কোকিলকণ্ঠী, চিকন, সূক্ষ্ম যা বার্ধক্যেও সেরকমই থেকে গেল, অক্ষত। আর এই গল্পই চড়ায় গিয়ে খুলে যাচ্ছে। যার অপরূপ প্রয়োগ করেছেন সলিল চৌধুরী তাঁর কঠিন চালচলনের বাংলা ও হিন্দি গানে। লতা নিজেই স্বীকার করেছেন 'লতা মঙ্গেশকর... ইন হার ওন ভয়েস' (নাসরিন মুন্নি কবির-এর সঙ্গে কথোপকথন) বইয়ে যে, 'সলিলবাবুর সুর হত বেজায় জটিল, অলংকারে অলংকারে গাঁথা। গাইতে কষ্ট, কিন্তু গেয়ে আনন্দ।' কথাগুলো যে বলার জন্য বলা নয়, তা কে না জানে! তাঁর সারা জীবনের গাওয়া গানের দশটা সেরা বাছতে গিয়ে বরাবরই একনম্বরে রেখেছেন 'ও সজনা, বরখা বহার আয়ি' গানটাকে। সলিল চৌধুরীর সুরে বিমল রায়ের 'পরখ' ছবির এই গানটা সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছিলাম সুরকারের মুখে। বলেছিলেন, গানের রেকর্ডিংয়ে যেতে গিয়ে বম্বের বিখ্যাত ট্রাফিকে আটকেছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে ওঁর ফিয়েট গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন এক অদ্ভুত ধ্বনি তুলতে লাগল। শুনতে শুনতে ওঁর মনে এল 'ও সজনা'-র সুর। উনি গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে লিখে ফেললেন সুরটা। বললেন, 'সুর করতে করতেই শুনতে পাচ্ছি লতা গাইছে গানটা।'

স্টুডিওয় বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর

লতা মঙ্গেশকর ও সলিল চৌধুরী

শুধু সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলাই নয়, ইংরেজিতে একবার এক গান গেয়েছিলেন, টরোন্টোয়, ১৯৮৫ সালে। না বলে দিলে কে বুঝবে এ কোনও মার্কিন বা ব্রিটিশ গায়িকার গলা নয়! কানাডার লেজেন্ডারি গায়িকা অ্যান মারে-র অনুরোধে তাঁরই গান 'ইউ নিডেড মি' গেয়ে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্প্রতি সলিলদার কন্যা অন্তরার এক লেখায় পড়লাম স্ত্রী সবিতাকে নিয়ে পাওয়াই লেকে যাওয়ার পথে 'না, যেও না'-র সুর মাথায় আসতে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসেন ওঁর বাবা, আর মুখে মুখে বাংলা বেসিক গানের লিরিকটা লিখে ফেলেন।

'ও সজ্‌না'-র বাংলা ভার্সানই হল ওই অতুলনীয় গীত 'না, যেও না, রজনী এখনও বাকি'। সম্প্রতি সলিলদার কন্যা অন্তরার এক লেখায় পড়লাম স্ত্রী সবিতাকে নিয়ে পাওয়াই লেকে যাওয়ার পথে 'না, যেও না'-র সুর মাথায় আসতে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসেন ওঁর বাবা, আর মুখে মুখে বাংলা বেসিক গানের লিরিকটা লিখে ফেলেন। 'ও সজ্‌না' বাণী বদলে হয়ে গেল 'না যেও না'। একই সুরে হিন্দি থেকে বাংলা অথবা বাংলা থেকে বাংলা থেকে হিন্দি গানে যাতায়াতের একটা চল-ই সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন সলিলদা। বাংলা না হিন্দি কোনটা যে আগে আর কোনটা যে পরে সে-খেয়ালও থাকত না। এই যাতায়াতের আর-একটা গল্পও আছে সলিলদার মুখে শোনা।

হিন্দি 'চাঁদ অওর সুরজ' ছবির 'ঝনন ঝনন বাজে রে বিছুয়া'-র (কথা শৈলেন্দ্র) জন্য সুর করছেন সলিলদা। এর অনেক আগেই কলাবতী রাগে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে একটা হিট বাংলা বেসিক করেছিলেন যার কথাও প্রায় একই ধরনের— 'ঝনন ঝনন বাজে সুরবাহারে রসশৃঙ্গারে'। আর ধনঞ্জয়বাবু গেয়েওছিলেন অতি অসাধারণ। লতা সলিলের সুর শুনেই বুঝে গিয়েছিলেন এ গান এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। তারপর যখন শুনলেন বাংলায় এ গান গেয়েছেন ধনঞ্জয়বাবু, সঙ্গে সঙ্গে বায়না ধরলেন ওই রেকর্ড এনে ওঁকে শোনাতে হবে। পরের ট্রিপে কলকাতা থেকে ওই ডিস্ক নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন লতাকে। আর ভদ্রমহিলা বারবার সেটা বাজিয়ে শুনে নিজের কাজ বুঝে নিয়েছিলেন। সলিলদা বলেছিলেন, 'এই হচ্ছে ডেডিকেশন, একাগ্রতা। যেটা লতা দেখিয়ে যায় সারাক্ষণ। ভাষা, সুর, স্টাইল নিখুঁত করাটা আসে এই অদ্ভুত ডেডিকেশন থেকে।' ধনঞ্জয়দাকে লতার ব্যাপারটা বলাতে হেসে বলেছিলেন, 'জানি। সলিল বলেছে। আরে, এই জন্যই তো লতা লতা।'

লতা কেন লতা তার এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা ওঁর গাওয়া গীতা স্তোত্র। 'এইচএমভি' সংস্থা প্রথম যখন ওঁর গীতা স্তোত্রের লং প্লে বাজারে আনে আমি সেই রেকর্ড শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। গীতা আকৈশোর আমার প্রিয় পাঠ এবং স্কুলজীবন থেকে কত যে গীতাপাঠ ও গীতাগান শুনে আসছি বলে বোঝাতে পারব না। তবে গীতার নবম, একাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের যে গীতানিবেদন লতার কণ্ঠে পেলাম তা একেবারে অকল্পনীয়! সারা সকাল তো বটেই, বাড়ি থাকলে সারাদিনই তখন ক্যাসেট টেপে বাজছে লতার গীতা। ইমনে মতো রাগ সুরে এত পবিত্র চেহারায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে ধরা হয়েছে ভগবানের কথাগুলো যে আমার কেবলই মনে হচ্ছে ঠিক এভাবেই কি শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গীতা গেয়ে শোনাননি অর্জুনকে? এত গভীর কথা, এত অপরূপ সংস্কৃত কাব্যে, এত রহস্যময় সৌন্দর্যে? আমার একটু খেদ ছিল যে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সাংখ্যপর্ব লতা কেন রেকর্ড করলেন না। এইচএমভি-র কর্তাব্যক্তিকে সেটা বলেওছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে গীতা লতার প্রিয় বই, প্রচুর ধ্যান দিয়ে শিক্ষা করে নিবিষ্ট হয়ে করেন। দেখুন, সময় বের করে কখনও না কখনও করে ফেলবেন।

সেটা শেষ অবধি হয়েছিল কি না জানি না। তবে লতাজি দেহরক্ষা করতে আমার কাজ হয়েছে ভগবদ্গীতা খুলে ওঁর গাওয়া ভগবানের গান শোনা। উনি যেই ধরছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং
জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন
চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।

অর্থাৎ, আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্তমূর্তি; আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যপ্ত। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অসংসর্গী বলে তাদের মধ্যে আধেয়ভাবে অবস্থিত নই। আমি যেন স্বয়ং কৃষ্ণর গান শুনছি! মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর অপেক্ষায় ছিলেন অন্যকণ্ঠে তাঁর এই গান এভাবে শোনার জন্য!

শুধু সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলাই নয়, ইংরেজিতে একবার এক গান গেয়েছিলেন, টরোন্টোয়, ১৯৮৫ সালে। না বলে দিলে কে বুঝবে এ কোনও মার্কিন বা ব্রিটিশ গায়িকার গলা নয়! কানাডার লেজেন্ডারি গায়িকা অ্যান মারে-র অনুরোধে তাঁরই গান 'ইউ নিডেড মি' গেয়ে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর চার বছর আগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরে গাইতে এসেছিলেন যখন তিন লাখ টাকার রেকর্ড ফি নিয়ে, তখন গ্র্যান্ড হোটেলে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল লতাজির সঙ্গে। ঠিক সাক্ষাৎকার নয়, আলাপই বলব, কারণ রেকর্ড করিনি। পরদিন প্রোগ্রাম, জায়গাটা দেখতে যাওয়ার ব্যাপার ছিল। কথা হচ্ছিল ইংরেজিতেই। কোনও বিলিতি টোন-টানের ব্যাপারই নেই। আর এখন ইউটিউবে সেই মারাঠি গলায় 'ইউ নিডেড মি' শুনে তো ধন্দে পড়ে যাচ্ছি, ঠিকঠাক শুনছি তো?

তারপরই এ-ও ভাবছি, গান-বাজনা তো হল একটা নিখুঁত, সর্বোত্তম রূপকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে বন্দি করা। গানের ক্ষেত্রে ভাষা এবং উচ্চারণ তার প্রথম, প্রধান পকড়। লতা কতটা কী বাংলা বলতে পারতেন জানি না, তবে হেমন্তদা, সলিলদার হাত ধরে বাংলা ও বাঙালির কাছে আসার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। ১৯৮৮-তে হেমন্তদার স্মৃতিকথা 'আমার গানের স্বরলিপি' প্রকাশ হয় যখন, কথা উঠল কাকে দিয়ে ভূমিকা লেখানো যায়। ওঁর গানের সুবর্ণজয়ন্তীতে নেতাজি ইন্ডোরে গাইতে এসেছিলেন লতা। তাঁকে ফের বলাটা কি ঠিক হবে? তবু আমি কিন্তু-কিন্তু করেও লতার নামটাই বলেছিলাম। হেমন্তদা একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। তার সাতদিনের মধ্যে ইংরেজিতে টাইপ করে সই করা ভূমিকা চলে এল। আর ফোন করে হেমন্তদাকে খেদ প্রকাশ, 'দাদা, আপনার বাংলা অটোবায়োগ্রাফির জন্য বাংলার ভূমিকা লেখা যে সম্ভব হল না!'

এই হচ্ছেন লতা। যাঁর সম্পর্কে আরেক বড় বাঙালির হিন্দিতে বলা কথাটাই বোধ হয় শেষ কথা, 'না হুয়া, না হোগা'— হয়নি, হবেও না।

তিনি পণ্ডিত রবিশংকর।

*সৌজন্য: সংবাদ প্রতিদিন*

# ‘লতা গীতকোষ’ : নেপথ্য ইতিহাস

**চিত্রা সরকার**
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা

আসমুদ্র হিমাচলের আপামর মানুষকে সুরের ঝর্ণাধারায় স্নাত করে সম্প্রতি চিরবিদায় নিলেন কিংবদন্তি কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর। দীর্ঘ ৮০ বছরের সংগীত জীবনে সংগীতসম্রাজ্ঞী ৩৮ টি ভাষায় প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি গান গেয়েছেন। শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যে নয়, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্যে সেইসব গান উচ্চতার চরমবিন্দু স্পর্শ করেছে, তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতবাসীর কাছে বাগ্‌দেবীর প্রতিভূ। 'Voice of the nation', 'Voice of the millennium', 'Nightingale of India' কোন অভিধাই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। হিন্দি, বাংলা, মারাঠীর পাশাপাশি অসমীয়া, ভোজপুরি, ছত্তীসগড়ী, ডোগরি, গাড়ওয়ালি, গুজরাটি, কন্নড়, কোঙ্কনি, মগধী, মৈথিলী, মালয়ালম, মণিপুরী, নেপালী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, ওড়িয়া, সংস্কৃত, প্রাকৃত, সিন্ধী, তামিল, তেলুগু, উর্দু - এইসব দেশীয় ভাষায় অসংখ্য গান গেয়ে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। শুধু তাই নয়, গেয়েছেন ইংরেজি, সিলোনিজ, রাশিয়ান, ডাচ, মালয়,স্বাহিলি, ল্যাটিনের মত বিদেশী ভাষায়। এইসব অজস্র কালজয়ী গানের একটা ‘ডেটাবেস’ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন – ডকুমেন্টেশনের এই ভাবনাটি প্রথম যাঁর মাথায় এসেছিল তিনি হুগলী শ্রীরামপুরের দে স্ট্রিটের বাসিন্দা স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়। ভাবনার সূত্রপাত আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। মহম্মদ রফি তখন সদ্য প্রয়াত। একটি পরিচিত সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকায় তিনজন আলোচকের কলমে রফি সাহেবের মোট গানের সংখ্যা দাঁড়াল তিনরকম। যথার্থ পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিতে পারলেন না গোটা দেশের কেউ। ঠিক সেই সময় গানপাগল সদ্য যুবক স্নেহাশিস সিদ্ধান্ত নিলেন সম্পূর্ণ তথ্যপঞ্জি সংবলিত সংগীত বিবরণী নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করবেন এবং তার জন্য বেছে নিলেন যে প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্বকে তিনি লতা মঙ্গেশকর। ১৯৮২ সালে যা ছিল অঙ্কুর, আজ তা পত্রপুষ্প পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

লতা মঙ্গেশকর ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়

পনেরোটি খণ্ডে যে 'লতা গীতকোষ' সৃজনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তারমধ্যে এগারোটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বয়ং লতাজির শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদধন্য হয়েছে।

'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর'— শুরুটা ছিল সেইরকমই। কত রসিকতা, কত ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। স্নেহাশিস তখন নলহাটির বাসিন্দা, রামপুরহাট কলেজের ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই সাংগীতিক পরিবেশ লালিত হয়েছেন। প্রথম সংগীত শিক্ষা মায়ের হাত ধরে। পরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছেন অধ্যাপক ধ্রুবতারা যোশী এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে। যাই হোক ১৯৯০ সাল নাগাদ কলকাতায় এসে আলাপ করলেন প্রখ্যাত সংগীত সংগ্রাহক সুরাজলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হারুবাবু নামেই তিনি সমাধিক পরিচিত ছিলেন, থাকতেন দমদম স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড়ের দিকে যেতে ডানদিকে রেডিওগলির বাড়িতে। এইবার আর সঙ্গীতশিক্ষার্থী হিসেবে নয়, সংগীত গবেষক হিসেবে নাড়া বাঁধলেন হারুবাবুর কাছে, মানলেন গুরু বলে। বুঝতে পারলেন বিক্ষিপ্তভাবে কাজ না করে করতে হবে কোম্পানির ক্যাটালগ ধরে। 'ডিস্কোগ্রাফি' কাকে বলে বোঝালেন হারুবাবু। হাত ধরে চিনিয়ে দিলেন শিয়ালদা বৈঠকখানার চোরাবাজার, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশে লেনিন সরণির ফুটপাথ, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের পুরনো রেকর্ড বিক্রির আখড়া। রেডিওগলির বাড়িতে বসে লতাজির গান নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা চলত তা ঋদ্ধ করেছে স্নেহাশিসবাবুকে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে লতা মঙ্গেশকরের গান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হলেন তিনি, আর পথপ্রদর্শক হলেন সুরাজলাল মুখোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে ছিল লতাজির গানের রেকর্ড সংগ্রহ করে তালিকা প্রস্তুতি, বাণী লিপিবদ্ধ করা ও সুর-তাল চিহ্নিত করার কাজ। বেসিক রেকর্ডে প্রকাশিত গানের ক্ষেত্রে সমস্যা কম তবে চলচ্চিত্রের গানের বিবরণী প্রস্তুতির ক্ষেত্রটি বেশ জটিল। শুধুমাত্র গীতিকার, সুরকার সুর, তাল বা আনুষঙ্গিক তথ্যের উল্লেখই সেক্ষেত্রে

যথেষ্ট নয়। কেননা সিনেমার গান রেকর্ড বা ক্যাসেট আকারে বেরোনোর সময় অনেকক্ষেত্রেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই চলচ্চিত্রটি দেখে উল্লেখযোগ্য তথ্য নথিবদ্ধ করা গবেষকের কর্তব্য। বলাবাহুল্য কাজটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তিবিদ্যা যেরকম উন্নত হয়েছে তাতে এই ধরনের কাজের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু নব্বই-এর দশকে বসে কাজগুলি করা স্নেহাশিসবাবুর পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল না। শুধু তো লতা মঙ্গেশকরের বাংলা ভাষায় গাওয়া গান নয়, অন্য প্রাদেশিক ভাষা এমনকি বিদেশী ভাষায় গাওয়া গানও স্নেহাশিস তাঁর সংকলনে রেখেছেন, ভাষা সেক্ষেত্রে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে একটুও দমেননি তিনি, প্রয়োজনে অন্য ভাষা শিখেছেন বা দক্ষ ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন সমস্যার সমাধানে। হায়দ্রাবাদে বেড়াতে গেলে কিংবা পুরীতে সমুদ্র স্নান করতে গেলে সেগুলো গৌণ হয়ে ওঠেছে, বরং মুখ্য হয়ে ওঠেছে তেলুগু বা ওড়িয়া গানের সুলুক সন্ধান করা। অরুন্ধতী ও সূর্যমুখী সিনেমার রেকর্ড তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ওড়িশা থেকেই। ১৯৫২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি সিনেমা 'বৈজু বাওরা' দিয়ে তাঁর সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। শ্রীরামপুরে হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট জুড়ে তাঁর আর্কাইভ, সেখানে গেলে দেখা মিলবে কোকিল কণ্ঠীর সমস্ত সংগীত সংক্রান্ত বই, গ্রামোফোন, রেকর্ড, সিডি, ক্যাসেট সবকিছু। দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি ভিনরাজ্যে গিয়েছেন বারবার, বা সাহায্য নিয়েছেন তাঁদের যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে ঐসব জায়গায়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০১ সালে স্নেহাশিসের নাম উঠেছে 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডস'-এ।

'লতা গীতকোষ'-এর প্রথম খণ্ডের কাজ চলাকালীন লতা মঙ্গেশকরকে চিঠি লিখতে থাকেন স্নেহাশিসবাবু। তখন তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনের মতো সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের। লতাজির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয় ১৯৯৬ সালে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সেদিন কানায় কানায় পূর্ণ। সাধারণ দর্শক স্নেহাশিস মরিয়া চেষ্টা করছেন লতাজির সঙ্গে দেখা করার। শেষপর্যন্ত তিনি জনপ্রিয় প্রেজেন্টার হরিশ ভিমানী ও আদিনাথ মঙ্গেশকারের সহযোগিতায় পৌঁছতে পারেন তাঁর কাছে, বহুকাল ধরে সঙ্গোপনে লালন করা স্বপ্ন সার্থক হয়। লতাজিকে পাঠানো চিঠির কোনো উত্তর না পেলেও বিষয়টি যে তিনি জানতেন বোঝা যায় হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের পুত্র আদিনাথের কথায় - "ইয়ে হি উ বাঙালিবাবু হ্যায় জো আপকো লেকর কাম কর রহা হ্যায়।" লতাজি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন, তবে বলতে ভোলেননি, "কিসিকো নেহি দেনা। ইয়ে আপকে লিয়ে।" সেই সূচনা - তারপর বহুবার ফোনে কথা হয়েছে। কিন্নরকণ্ঠী নিজেও তাঁর তথ্যের প্রয়োজনে ফোন করেছেন স্নেহাশিসকে। একবার আঠাশে সেপ্টেম্বর লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিনে স্নেহাশিস ফোন করে শুভেচ্ছা জানানোর সময় দুম করে বলে বসলেন – "আমি আপনাকে একটা গান উপহার দিতে চাই।" সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি, স্নেহাশিস সেদিন একটি দাদরা শুনিয়েছিলেন। দু'বছর আগে একটি অনলাইন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার সূত্রে স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বর্তমান প্রতিবেদকের। এসব কথা উচ্চারণ করার সময় শিশুর সারল্য চলে আসে তাঁর মধ্যে যা নজর এড়ায় না যে কোন সংবেদনশীল মানুষের। গত ৬ ফেব্রুয়ারি লতাজির বিদায়বেলায় তাই কথা বলতে পারছিলেন না শোকবিহ্বল স্নেহাশিস। এ যেন তাঁর দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগ। প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনে বিভিন্ন সময়ে তাঁরই গাওয়া গান নিয়ে একটি সিডি তৈরী করে পাঠাতেন স্নেহাশিস, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করতেন। খুশি হতেন লতাজি। ২০০৬ সালে কাজের প্রয়োজনে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্নেহাশিস মুম্বাইতে তাঁর বাড়ি প্রভুকুঞ্জে। বিস্ময় বালকের মত সমস্ত বাড়ি ঘুরে দেখেন, এমনকি প্রিয় শিল্পীকে সটান বলেই বসেন "আপনার শোবার ঘরটাও দেখতে চাই"। নিরাশ করেননি অনুসন্ধিৎসু গবেষককে। সস্নেহে বলেছেন — "উসমে দেখনে কা কেয়া

চীজ হ্যায়?" প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় স্কুলে বাংলার শিক্ষক যখন 'তোমার প্রিয় শখ' রচনা লিখতে দিয়েছিলেন, তখন লিখেছিলাম 'আমার শখ মানুষ দেখা'। জীবনের পরতে পরতে বিচিত্র স্বভাবের মানুষ দেখতে দেখতে থমকে যাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরকম ঐশ্বরিক স্বভাবের মানুষদের দেখে। যারপরনাই বিস্মিত হতে হয় যখন জানা যায় লতা মঙ্গেশকর অবসর সময় কাটাতেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথচলতি মানুষ দেখে। বাস করতেন অতি সাদামাটা ঘরে। একটি সিঙ্গল খাট, একটি ছোট ওয়ার-ড্রোব, একটি ড্রেসিং টেবিল— কোথাও কোনো অতিশয্য নেই। শুধুমাত্র গানের ঘরের বাইরের দরজার 'সাইলেন্স প্লিজ' পোষ্টারের নীচে লেখা, 'জিনিয়াস ইনসাইড'। এই স্বাভিমান যেন বিশ্ববরেণ্য মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়াণের পর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জনপ্রিয় মানুষটির সাদা-কালো ছবি তোলার আগ্রহ, ক্রিকেট ম্যাচ দেখার পাশাপাশি দামী গাড়ির প্রতি আকর্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। হলিউডের সিনেমার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ দুর্বলতা; আবার ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন, ন'খানা পোষ্য সারমেয়র প্রতি ছিল অপার বাৎসল্য। আপাত ধীর স্থির অনাড়ম্বর মানুষটির স্বভাবের গভীরের এ হেন চঞ্চলতাই হয়তো 'বন্দেমাতরম' থেকে শুরু করে 'দো ঘুঁট মুঝে ভি পিলাদে শরাবী'- সব ধরনের গানে তাঁকে সাবলীল স্বচ্ছন্দ করেছে। ভাবতে অবাক লাগে শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারে অবস্থিত স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়ের ছোট্ট গানের স্কুলের জন্য তিনটি নাম ভেবেছিলেন লতা মঙ্গেশকর — এক. মালতীলতা, দুই. স্নেহজ্যোতি (উল্লেখ্য, স্নেহাশিসবাবুর স্ত্রী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়), তিন. স্বরগঙ্গা। তৃতীয় নামটিই বহাল হয়। একটি চিঠিতে 'স্বরগঙ্গা'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফ্যাক্সও করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

১৯৯৭ এ বিশ্বভারতীতে দেশিকোত্তম সম্মান নিতে উপস্থিত হয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। আশ্রম প্রাঙ্গণ, আম্রকুঞ্জে অগনিত গুণমুগ্ধ। সপ্তপর্ণী হাতে সুরেলা কণ্ঠে নমস্কার জানালেন সবাইকে। গান গাওয়ার কোন কথা নেই, কিন্তু অনুরাগী ভক্তরা নাছোড়। লতাজি গাইতে শুরু করলেন সরস্বতী বন্দনা। তৈরি হল ইতিহাস। কিন্তু তখন তো সাধারণের হাতে মুঠোফোন ছিল না রেকর্ড করার জন্য। স্নেহাশিস অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ গানটি রেকর্ড করেছেন। অনেক পত্র-বিনিময় এবং যাতায়াতের পর বরফ গলল, বোঝাতে পারলেন তিনি কেন তাঁর গানটি প্রয়োজন। শেষপর্যন্ত বিশ্বভারতীর আর্কাইভ থেকে পেলেন গানের রেকর্ড। এখনও পর্যন্ত যে ১১ টি খণ্ডে 'লতা গীতকোষ' প্রকাশিত হয়েছে তাতে রয়েছে ৫১৫৮ টি গানের তথ্যাবলি। ন'টি খণ্ডে রয়েছে লতা মঙ্গেশকরের হিন্দি গানের যাবতীয় তথ্য ও লিরিক। একটি খণ্ডে রয়েছে বাংলা গান এবং একটি খণ্ডে মারাঠী ও কোঙ্কণি গানের তথ্যপঞ্জি। বইগুলির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন মান্না দে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য, এ.আর. রহমান, যশ চোপড়া, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ দিকপাল সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। ২০০২-এ তাজবেঙ্গল হোটেলে কথোপকথনের সময় লতাজি মারাঠি গানের কাজ কতটা এগিয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বহু ভাষায় সঙ্গীতসাধনা করলেও মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা তাঁর ছিল বুঝতে অসুবিধে হয় না। দেরিতে হলেও কথা রেখেছিলেন স্নেহাশিস। সুরমানবীর জীবদ্দশায় তাঁর শেষ জন্মদিনে স্নেহাশিসের উপহার ছিল মারাঠি ভাষায় গাওয়া গানের সম্পূর্ণ সংকলন, যার প্রচ্ছদ তৈরী হয়েছে ১৩ বছর বয়সী অভিনেত্রী লতার ছবি দিয়ে। 'লতা গীতকোষ'-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বাংলা গানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং লিরিক। ৭৫ টি বাংলা ছায়াছবিতে মোট ১৩৯ টি বাংলা গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক ও অন্যান্য মোট ৮৪ টি বাংলা গান গেয়েছেন তিনি। গেয়েছেন দুটি ভার্সান গানও ('ম্যায় নে প্যার কিয়া' ছবির 'দিল দিওয়ানা বিন সজনো

কে মানে না' ও '1942 Love Story' ছবির 'কুছ না কহো কুছ ভি না কহো'র বাংলা ভার্সান)। সব মিলিয়ে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া বাংলা গানের সংখ্যা ২২৫টি। ১৯৫৩ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা' এবং 'মধুগন্ধে ভরা'- যা লতাজির গাওয়া প্রথম বাংলা গান। ১৯৫৭ সালে পবিত্র মিত্রের কথা এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া প্রথম বাংলা আধুনিক গান 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছে। প্রথম বাংলা ছায়াছবির গানের প্রসঙ্গে বলতে হয় মারাঠী ও বাংলা দ্বিভাষিক ছবি 'অমর ভূপালী'র (১৯৫২) কথা। 'তুয়া পীরিতে দুঃখ সদা দিও না মোরে', 'কাঁহো দূর দেশে যাও বঁধুয়া', 'সুখে মাতে চিত', 'ঘন শ্যাম সুন্দর', 'লটপট লটপট'— এইসব গানকে বিশুদ্ধ বাংলা ছায়াছবির গান বলা যায় কি? প্রশ্ন থেকেই যায়। ঠিক তার পরের বছর 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ছায়াছবিতে লতা গেয়েছেন দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' এবং 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা'। ফলে বাংলা ছায়াছবির গান বলতে যা বোঝায় তা লতা মঙ্গেশকর গাইলেন 'অসমাপ্ত' (১৯৫৬) ছায়াছবিতে নচিকেতা ঘোষের সুরে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় 'রিমিকি ঝিমিকি ছন্দে যমুনায় কে যায়?' এবং 'পূর্ণিমা নয় এ-যেন রাহুর গ্রাস', যা আজও আমাদের আবিষ্ট করে রাখে।

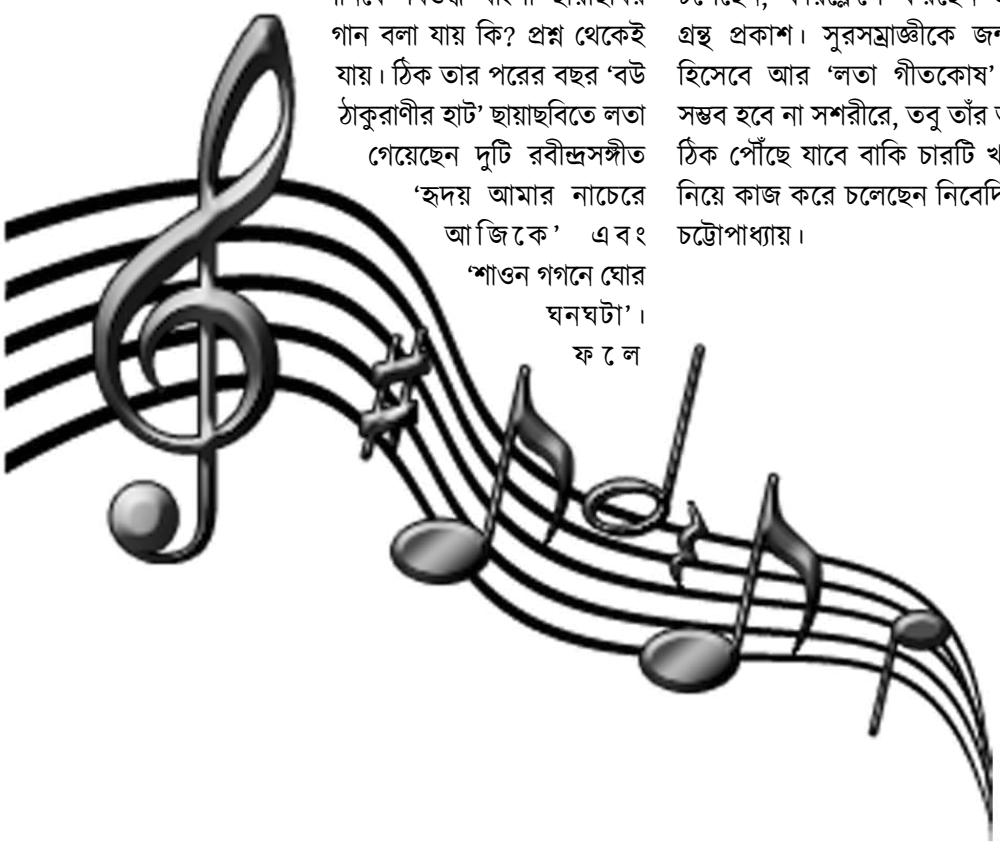

বাংলা গানের জগতে লতা মঙ্গেশকরকে এনে বাঙালিকে ঋদ্ধ করেছেন যে দুজন তাঁরা প্রশ্নাতীতভাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সলিল চৌধুরী। মিন্টো পার্কের বাড়িতে স্নেহাশিসের পিঠে হাত রেখে ভরসা দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী— "তুমি এমন একজনকে নিয়ে কাজ করছো, সারাজীবন সুরের মধ্যে থাকবে"। সুরে সুরে কেটে গেল চল্লিশ বছর। আরো পথচলা বাকি। সরকারী বেসরকারী কোনোরকম সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আত্যন্তিক প্রয়াসে কাজ করে চলেছেন, কায়ক্লেশে করছেন একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ। সুরসম্রাজ্ঞীকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে আর 'লতা গীতকোষ' উপহার দেওয়া সম্ভব হবে না সশরীরে, তবু তাঁর অন্তহীন যাত্রাপথে ঠিক পৌঁছে যাবে বাকি চারটি খণ্ড – এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে চলেছেন নিবেদিতপ্রাণ স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়।

# গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

**শঙ্কর কুমার নাথ**
**চিকিৎসা বিজ্ঞান সচিব, দি এশিয়াটিক সোসাইটি**

১৯৫৫-৫৬ সাল। কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে এক উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসেছে। এখানে গাইবার জন্য আমন্ত্রিত ২৪/২৫ বছরের একটি মেয়ে, ইতিমধ্যে সঙ্গীতজগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁরই মুখ থেকে শুনি সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের কথা :

"শচীনদাও (দেববর্মন) ওই ফাংশনে নিমন্ত্রিত। বাংলা ছবির বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ ছিলেন। শচীনদা উইঙ্গসের পাশে বসে। আমি দৃষ্টি ছবির 'বলে কুহু কুহু কোয়েলা' গানটা ধরলাম। শুরুতে পাপিয়ার ডাকের মতো ক্রমেটিক নোট্‌সের একটা ব্যাপার ছিল। কোমল ও শুদ্ধ স্বরে যাব। ওটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপরই মূল গানটা শুরু। পরে নচিদাই আমাকে বলেছিলেন, যেই না পাপিয়ার ডাক ধরেছি শচীনদা 'গেল গিয়া' 'গেল গিয়া' বলে হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। শচীনদার আশঙ্কা ছিল ক্রমেটিক নোট্‌সটা আমি ঠিকভাবে করতে পারব কি না। আসলে ওটা ভীষণ শক্ত। শচীনদার শঙ্কিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। নচিদা হাসতে হাসতে বললেন, সন্ধ্যা, তুমি তো ওই নোট্‌স ধরলে, ওদিকে শচীনদা 'গেল গিয়া' 'গেল গিয়া' করতে লাগলেন। তুমি জায়গাটা নিখুঁত করতে পেরেছ দেখে শচীনদার মুখ আবার প্রশান্ত হয়ে ওঠে।"

এতক্ষণ যিনি স্মৃতিচারণা করছিলেন, তিনিই হলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাংলা তথা ভারতের অন্যতম কয়েকজন সেরা কণ্ঠশিল্পীদের একজন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর কলকাতার ঢাকুরিয়াতে; বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মা হেমপ্রভা দেবীর কনিষ্ঠতম সন্তান। ওঁর দাদা দিদিরা হলেন সরসী, রবীন্দ্রনাথ, সুধা, ধীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যার গানের হাতেখড়ি হয়েছিল মা-বাবার কাছেই। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ ও ঝোঁকটা বুঝতে পেরেছিলেন বড়দা রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতে সন্ধ্যার প্রতিষ্ঠার পিছনে এই বড়দার অবদানের কথা তিনি সারা জীবন স্মরণ করে গেছেন। ছোট্টবেলায় শিখেছেন সন্তোষ বসু মল্লিকের কাছে। মাত্র ১২ বছর বয়সে সন্ধ্যা প্রথম গান গাইলেন রেডিও-র গল্পদাদুর আসরে; প্রথম পারিশ্রমিক পেলেন ৫ টাকা। সে-সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন সঙ্গীতাচার্য যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতকে তিনি ভালবেসেছেন মনপ্রাণ দিয়ে, কঠোর অনুশীলন করেছেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এই আপ্তবাক্যকে মূলধন করে। তাই শিখেছেন পন্ডিত এ. টি. কানন, চিন্ময় লাহিড়ীর মতো বিদগ্ধ সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে।

১৯৪৫ সালে সন্ধ্যার প্রথম বেসিক রেকর্ড বেরোল এইচ. এম. ভি. থেকে, দুপিঠে দুটি গান 'তুমি ফিরায়ে দিয়াছ' এবং 'তোমার আকাশে ঝিলমিল করে', কথা ও সুর গিরীণ চক্রবর্তীর; তখন সন্ধ্যার বয়স মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস। ১৯৪৩ সালেই ইতিমধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক প্রতিযোগিতায় ভজন বিভাগে প্রথম স্থান পেলেন। ১৯৪৬ সালের ৬ এপ্রিল 'গীতশ্রী' পরীক্ষায় প্রথম হলেন। এইখানে পরীক্ষক ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ দবীর

খাঁ প্রমুখ। নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে শুরু করলেন পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র কাছে। ওস্তাদজির মৃত্যুর পর (১৯৬৮) তাঁর পুত্র ওস্তাদ মুনাবর আলি খাঁয়ের কাছেও তালিম অব্যাহত রাখেন সন্ধ্যা।

১৯৪৮ সালে প্রথম তিনি ছায়াছবিতে গাইবার সুযোগ পেলেন---রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় 'অঞ্জনগড়' এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় 'সমাপিকা' ছবিতে। ঐ ১৯৪৮ সালেই সেরা প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে পেলেন প্রথম বি. এফ. জে. এ. পুরস্কার। তারপর শুধুই ইতিহাস।

১৯৫০ সালে শচীনদেব বর্মনের ডাকে পাড়ি দিলেন বোম্বেতে। এ-বিষয়ে সন্ধ্যার নিজের মুখ থেকেই খানিকটা শুনে নিই :

"বম্বেতে শচীনদা আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল খার রেলস্টেশনের গায়ে 'এভার গ্রিন' হোটেলে। আজও আমি চোখ বুজলে হোটেলটাকে দেখতে পাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার একটা কোণের ঘরে শচীনদা থাকতেন। আমাদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একতলার একটা ঘরে। পরে আমি দোতলায় উঠে যাই।

শচীনদা এত স্নেহশীল ছিলেন, প্রতিদিন একবার করে আমার ঘরে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। আমি ঠিকমতো প্র্যাকটিস করছি কি না, আমার খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে কি না ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর।"

তবে হিন্দিতে সন্ধ্যা প্রথম প্লে-ব্যাক করলেন কিন্তু সুরকার অনিল বিশ্বাসের সঙ্গীত পরিচালনায় 'তারানা' ছবিতে। গাইলেন লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে ডুয়েট গান—'বোল পাপিহে বোলরে'। বোম্বের ফিল্মজগৎকে নাড়িয়ে দিয়ে তিনি মোট ১৭টি ছায়াছবিতে গান গাইলেন; গাইলেন শচীনদেব বর্মনসহ বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত সুরকারদের সুরে।

কিন্তু ১৯৫২ সালেই তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়, বাঙলার সঙ্গীতজগতে। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের অক্টোবরে কমল ঘোষের কথায় এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সেই সাড়া জাগানো, কালজয়ী গানটি করলেন 'ওগো মোর গীতিময়'। ১৯৫১ সালে চিত্ত রায়ের প্রশিক্ষণে প্রথম নজরুলগীতি রেকর্ড করলেন। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে গাইলেন সলিল চৌধুরী সুরারোপিত গান 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' এবং 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে'। সঙ্গীত-পিপাসুদের মধ্যে আলোড়ন উঠল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হল—'যেতে দাও গেল যারা' এবং 'ওগো তোরা কে যাবি পারে'।

১৯৬৬ সালের ১০ মার্চ গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন সন্ধ্যা। কন্যা ঝিনুকের জন্ম ওই বছর ১৯ ডিসেম্বর। সারা জীবন সঙ্গীতের সব ধারাতেই তিনি অবগাহন করেছেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে সরস গান সর্বত্র, খেয়াল, ঠুংরিতে তাঁর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। আধুনিক গানে বিশ্বের সমস্ত বাঙালির কাছে তিনি বিস্ময়, নয়নের মণি। 'মধুর মধুর বংশী বাজে' (১৯৫৯), 'আর ডেকোনা সেই মধু নামে' (১৯৬০), 'পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে' (১৯৬১), 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা' (১৯৬২), 'যদি নাম ধরে তারে ডাকি' (১৯৬৭), 'চন্দন পালঙ্কে শুয়ে' (১৯৭৫) ইত্যাদি অসংখ্য বেসিক গান এবং ছায়াছবির গানগুলি তাঁকে সঙ্গীতজগতে অমর করে রেখেছে।

বলাই বাহুল্য, বাংলা ছায়াছবিতে যেমন উত্তম -সুপ্রিয়া জুটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনি তাঁদেরই জন্য নেপথ্যে গান গেয়ে হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটিও অক্ষয়-অমর হয়ে থাকলেন। জীবনে বহু পুরস্কার এবং সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। 'নিশিপদ্ম' ও 'জয় জয়ন্তী' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার (১৯৭০-৭১), 'আলাউদ্দিন পুরস্কার' (১৯৯১), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডিলিট (১৯৯৫) সহ অসংখ্য পুরস্কারে, উপাধিতে তিনি অলংকৃত হয়েছেন। শেষ জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন 'পদ্মশ্রী'।

তাঁর কথা দিয়েই শেষ করব এই নিবন্ধ ঃ

"অনিলদার (সুরকার অনিল বিশ্বাস) রিহার্সালের ধরণটাও ছিল চমৎকার। কোথায় কী ভুলচুক হচ্ছে সুন্দর করে ধরিয়ে দিতেন। আগে তো সঙ্গীত

পরিচালকদের বাড়িতে গিয়ে রিহার্সাল করতে হত আমাদের। কয়েকদিন ধরে গান তোলা হত। তারপর পুরো অর্কেস্ট্রার সঙ্গে রিহার্সাল। কলকাতা-বম্বে সব জায়গায় এরকম করেছি। সঙ্গীত পরিচালক খুশি হলে তবেই রেকর্ডিং। এখন এসব বদলে গেছে। কোনওরকম গান তোলা হচ্ছে। অর্কেস্ট্রার সঙ্গে রিহার্সালের বালাই নেই। রেকর্ডিংয়ের ধরনটাও এখন পাল্টে গেছে। মিউজিক-ট্র্যাক আগেই তৈরি। চারদিকে শুনি সময়ের অভাব। গান নিয়ে আজকাল কেউ গভীরভাবে ভাবে না। সবকিছুই চটজলদি। চারদিকে কেমন নৈরাশ্য। এই নৈরাশ্যের ছাপ সঙ্গীতের গায়েও লেগেছে।"

স্পষ্টত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নিরাশার ছাপ। আবার তিনিই বাংলা গান নিয়ে আশাবাদী হয়ে একস্থানে লিখেছেন :

"আমাদের এই বাংলার ঘরে ঘরে যে কত সুন্দর গলা আছে। আমি আগেই বলেছি, ঠিক সময়ে ঠিক হাতে পড়লে, ঠিক শিক্ষকের কাছে গেলে প্রতিভার বিকাশ ঘটবেই।"

হ্যাঁ, বাংলা সঙ্গীতের এই দোলাচলের মধ্যেই চলে গেলেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ১৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, ২০২২-তে একটা বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি করে। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

**তথ্যসূত্র :**

*ওগো মোর গীতিময়*—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
বিভিন্ন সাময়িক পত্র

সচিব

## মুক্তিযুদ্ধ ও গীতশ্রী

• ১৯৭১ সাল। গোটা ওপার বাংলা লড়াই করছে খান সেনাদের অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে। স্বাধীন দেশের লক্ষ্যে। মুক্তিযুদ্ধের লড়াইটা পূর্ব পাকিস্তানে হলেও কলকাতা তখন হয়ে উঠেছে মুজিবনগর। ওদিক থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। নেই থাকা, খাওয়ার জায়গা। এহেন সময় মুজিবের প্রাণের বাংলাদেশের হয়ে গলা ছেড়েছিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন আপামর বাঙালির বার্তা। জন্মভিটে ছেড়ে পাগলের মতো পালিয়ে আসছে মানুষ। তাঁদের জন্য চাঁদা তুলতে গান করলেন গীতশ্রী। বাংলার সঙ্গীত জগতের দিকপালদের সঙ্গে তিনিও সামিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। উদ্বাস্তুদের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদেরও আর্থিক সাহায্যেও পিছিয়ে ছিলেন না সন্ধ্যা। এখানেই শেষ নয়। ওই বছরের ২৫ মে কলকাতার বালিগঞ্জে প্রতিষ্ঠা হল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সমর দাশ। তিনিও পাশে পেয়েছিলেন গীতশ্রীকে। বেতার কেন্দ্র তৈরির জন্য শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, পাশে ছিলেন গান নিয়েও। পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার পর, তাঁর দেশে ফেরা উপলক্ষে ওই বেতার কেন্দ্রে গান গেয়েছিলেন স্বর্ণযুগের এই শিল্পী। আবিদুর রহমানের কথায় এবং সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে...' গানটি সত্যিই যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের থিম সং। গীতশ্রীর এই অবদান ভোলেনি বাংলাদেশও। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম ভাষাদিবসের অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরেও সেই স্মৃতি একইরকম তরতাজা।

সৌজন্য ঃ *বর্তমান*

# সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান

**দেবপ্রসাদ দাস**
গবেষক ও লেখক

যে বছর বাংলা ছায়াছবি নির্বাক থেকে সবাক হল, কাকতালীয় হলেও সেই ১৯৩১ সনেই বাংলা ছায়াছবির গানের মহাগায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্ম। যতদূর জানা যায়, ছায়াছবি সবাক হওয়ার বছর তিনেক পর রাইচাঁদ বড়াল এবং পঙ্কজ মল্লিক সুরারোপিত 'ভাগ্যচক্র' ছায়াছবি থেকেই বাংলা ছায়াছবির প্লেব্যাক যুগের শুরু।'প্লেব্যাক' পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হওয়ার প্রায় পনেরো বছর পর ১৯৪৮ সালে বাংলা ছায়াছবির প্লেব্যাক ভুবনে আসেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম 'অঞ্জনগড়'। শৈলেন রায়ের গীত এবং রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় প্রথম প্লেব্যাক 'মোর গান গুণ গুণ ভ্রমরের মিঠে বোল ঝুলনার'(VE 2555)। শুধু 'অঞ্জনগড়'ই নয়, 'সমাপিকা', 'তরুণের স্বপ্ন', 'নন্দরাণীর সংসার' ইত্যাদি আরও অন্তত তিনটি ছায়াছবিতে সেই বছরই উনি নেপথ্যে গেয়েছিলেন। কিন্তু না, এই গানগুলোর কোনোটিই সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যের গান নয়। কারণ ১৯৪৮ সালে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের বিজয় রথ রাজপথে নেমে গেলেও ছায়াছবিতে সুচিত্রা সেনের বিজয় কেতন তখনও ওড়েনি। তাঁর আগমন আরও প্রায় পাঁচ বছর পরে, ১৯৫৩ সালে। ছবির নাম 'সাত নম্বর কয়েদি'। (সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল; ঘটনাক্রমে যিনি ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নেপথ্য গানেরও সঙ্গীত পরিচালক।) কিন্তু সেই ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কোনো গান ছিলনা। গান গেয়েছিলেন আলপনা ব্যানার্জী। সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের প্রথম মেলবন্ধন ঘটল অনুপম ঘটক সুরারোপিত ১৯৫৪ এর সাড়া জাগানো ছায়াছবি--'অগ্নিপরীক্ষা'তে। আক্ষরিক অর্থেই যেন অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল সঙ্গীত ও অভিনয়ের একীভূত ঘটনের অপূর্ব রসায়নের এবং দুজনেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন পরীক্ষার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে। শুরু হয়ে গেল বাংলা ছায়াছবির নেপথ্য গানের এক অবিসংবাদিত গৌরবময় যুগ-- সন্ধ্যা-সুচিত্রা যুগ।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শেখা নিয়ে (মুদ্রিত মাধ্যমেই) একটা কথা প্রচলিত আছে যে তুলনা মূলক অসুন্দর চেহারার ঘাটতি মেটাতেই নাকি ওঁর সঙ্গীত শিক্ষার শুরু। গান উনি শিখলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রাব্য মিষ্ট সঙ্গীতের নেপথ্যে অভিব্যক্তির তথাকথিত সেই সুন্দর মুখের ঘাটতি হয়তো মনে মনে থেকেই গিয়েছিল। মিষ্টি গানের যেমন চাওয়া ছিল একটি মিষ্টি মুখ, তেমনি একটি মিষ্টি মুখেরও হয়তো পাওয়ার ছিল মিষ্টি সুর। সেই চাওয়া-পাওয়াই যেন সেদিন হঠাৎই এক হয়ে গিয়েছিল মুসৌরির কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ী পথের 'অগ্নিপরীক্ষা'র গানে। উত্তম-সুচিত্রার প্রথম পরিচিতির রোমান্টিক সংলাপান্তে সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'গানে মোর কোন্ ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়'(GE30282) গান যেন বাঙ্গালি হৃদয়ে ছুঁইয়ে দিয়েছিল ঘুম ভাঙ্গানিয়া যাদুকাঠি। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গানের এই ছিল শুভ মহরত। এই ছবিতে সুচিত্রা সেনের

ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আরও তিনটি গান ছিল। 'ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্ন ভরা সম্ভাষণ'(GE 30283), 'যদি ভুল করে ভুল মধুর হল,মন কেন মানে না'(GE 30282),'কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে থাকো'(GE30283)। সব গানই এক কথায় সুপার ডুপার হিট। দর্শকদের কাছে সে গান হয়ে উঠেছিল একান্তই তাপসীদেবী ওরফে সুচিত্রা সেনের গান।

শোনা যায় 'গানে মোর কোন্ ইন্দ্রধনু' গানটি নাকি ছবির পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠীর বিভূতি লাহার একেবারেই পছন্দ ছিলনা। উনি নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন ''এই গান রাখলে ছবি নিশ্চিত ফ্লপ হবে''। সেই শুনে সঙ্গীত পরিচালক অনুপম ঘটক নাকি বলেছিলেন ''আমাকেই যদি সঙ্গীত পরিচালনা করতে হয়, তবে এই গান ছবিতে থাকবেই''। অগত্যা নিমরাজি হয়েই ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিল এই গান। শুধু ব্যবহারই নয়, নায়কের স্মৃতি রোমন্থনের দৃশ্যের প্রয়োজনে পর পর তিনবার এ গানের পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছিল। পরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু প্রশ্ন হল সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান এত হিট হল কেন? একটু খেয়াল করলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে যে প্রথম ছবির এই গানগুলোতে সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সুরের ওঠা নামা বা শব্দোচ্চারণের ভঙ্গির সাথে মেলেনি। তাহলে এই জুটি হঠাৎ এত জনপ্রিয় হল কী করে? হয়তো কথা বলার অভিব্যক্তি এবং ধ্বনিগত একটা অদ্ভুত মিল ছিল দু'জনার। সেটা একের ওপর অপরের কোন রকম অমোঘ প্রভাব, নাকি নিতান্তই কাকতালীয়, বলা কঠিন। কিন্তু সেই মেলবন্ধন তাঁদের হয়েছিল। গান পেয়েছিল তার সার্থকতম অভিপ্রকাশ। অভিপ্রকাশ খুঁজে পেয়েছিল তার সার্থকতম সুরমূর্চ্ছনা।

এর পর? এর পর বছরের পর বছর শুধু দুজনের মুকুটে একের পর এক লেগেছে রঙ্গীন পালকের পর পালক। দীর্ঘায়িত হয়েছে তাঁদের জনচিত্তজয়ী গানের তালিকা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মোট নেপথ্য গায়নের পরিসংখ্যান মোটামুটি ২৮০ টি ছায়াছবিতে ৫০০ গানের কাছাকাছি। অন্য দিকে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত পঁচিশ বছরে সুচিত্রা সেন অভিনীত বাংলা ছায়াছবির পরিসংখ্যান মোটামুটি প্রায় ৫৩টি। এত ছায়াছবির মধ্যে অনেকগুলোতেই সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান বাংলা ছায়াছবিকে বারংবার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে। প্রথমেই মনে পড়ছে রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত ১৯৫৫ সালে মুক্তি প্রাপ্ত 'সবার উপরে' ছায়াছবিটির গানের কথা। জোছনা ছড়ানো খোলা বারান্দায় সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত' এবং 'জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া' (GE30317)গান দুটো বা ১৯৫৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথে হল দেরী'র 'এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার', 'তুমি না হয় রহিতে কাছে'(GE 30387) বা ১৯৬২ সনের 'বিপাশা' ছবিতে দর্পণে নিজের মুখোমুখি বিপাশা (সুচিত্রা) যখন গান ধরেন 'আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোর নিশীথ বাসর শয্যায়'(GE 30498), তখন বাঙ্গালি মননে এক হয়ে গিয়েছিলেন দুই ভিন্ন সত্তা – সন্ধ্যা-সুচিত্রা। প্রসঙ্গক্রমেই মনে পড়ছে ১৯৫৯ এর 'চাওয়া পাওয়া' ছবির কোনো এক কাব্যময় নির্জনতায় 'এই যে কাছে ডাকা এই যে বসে থাকা বন্ধু'(GE 30419) গানটির কথা। এক কথায় রোমান্টিকতার এক গভীর অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল আমাদের। আবার ১৯৬১ এর 'সপ্তপদী'র 'এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হোতো' (GE 30485) গানের গতিময় লাস্য-উচ্ছ্বাসে রীণা ব্রাউন চরিত্রে সুচিত্রার লিপে যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে আমরা পেয়েছি, হয়তো ১৯৬৯ এর 'কমললতা'য় সন্ধ্যা মুখার্জীর গায়ন থেকে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ 'কমললতা'র কমল বৈষ্ণবী রূপী সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যখন রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের অঙ্গনে গান ধরেন 'নয়ন মোহন শ্যাম নয়ন ছাড়িয়া মোর'(TAEC 4038) তখন কীর্ত্তনের

ভক্তিরসে রীণা ব্রাউনের কোনো ছায়া না থাকলেও সন্ধ্যা-সুচিত্রা কিন্তু মিলেমিশে একাকার। সুচিত্রা সেনের ওষ্ঠ-নেপথ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শেষ গান 'স্বপ্ন কখনো সত্যি যে হতে পারে বুঝিনি তো আগে, যা কিছু চেয়েছি সবটুকু পেয়েছি'(7EPE 5092)। ছায়াছবি -- 'প্রণয় পাশা'। সন ১৯৭৮। এটাই সুচিত্রা সেন অভিনীত শেষ বাংলা ছায়াছবি।

অবশ্যই তাঁরা দুজন দুজনের শিল্পী সত্তাকে বুঝতেন, বুঝতেন ছায়াছবির গল্প-দৃশ্যের প্রয়োজনকে এবং সেই মতোই হয়তো একে অপরকে অদৃশ্য ছোঁয়ায় প্রভাবিতও করতেন; হয়ে উঠতেন একে অপরের পরিপূরক। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যেমন গান গাওয়ার আগে গানের দৃশ্যটি সুচারু ভাবে বুঝে নিতেন, শোনা যায় সুচিত্রা সেনও নাকি গান রেকর্ডিংয়ের সময় স্টুডিওতে বসে সন্ধ্যা মুখার্জীকে অনুধাবন করতেন। দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সেই বোঝাবুঝি, সেই একীভূত হওয়াই হয়তো দুজনকে করে তুলেছিল দুজনের পরিপূরক।

# সংগ্রামী সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

**শান্তনু বসু**
সঙ্গীত পরিচালক ও গবেষক

ফেব্রুয়ারি ২০২২। পরপারের কোনও অশুভ শক্তি যেন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে অতর্কিতে ঢুকে পড়েছে ভারতবর্ষের সঙ্গীত মহলে। একের পরে এক মহীরুহ পতন। একসময় বাংলা ও মুম্বাইয়ের সঙ্গীত মহলের মধ্যে যে লড়াই ছিল তাতে, এ বলে আমায় দেখ্ তো আর একজন বলে আমায়। এখন আর সে লড়াই নেই। কারণ অসমতা। কিন্তু 'মৃত্যু' যেন সেই লড়াইকে আবার জাগিয়ে তুললো। ৬ই ফেব্রুয়ারি 'ভারতরত্ন' লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে শুরু। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকালে চলে গেলেন 'বঙ্গরত্ন' গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ওই দিনই রাতে চলে গেলেন সুরকার বাপি লাহিড়ী। আর ২১শে ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বাংলা গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরকার হিসেবে তিনিই ছিলেন সেই যুগের শেষ প্রতিনিধি।

বহু সময় মানুষটির সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পাওয়ায় এবং নানা আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর জীবনের নানা সময়ের নানান কথা। একটা কথা এখানে বলে রাখি আমাদের সবার প্রিয় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে ছিলেন অভিজিৎদা। যে কারণে এখানেও প্রণম্য অগ্রজকে আমি 'অভিজিৎদা' বলেই সম্বোধন করব। এই রচনায় আমি শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরব না। বরং তুলে ধরব ব্যক্তিগত আলাপচারিতার কিছু কিছু অংশ যা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আসলে একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টির মধ্যে তাঁর জীবন বোধ, আদর্শ, নীতি ইত্যাদি যে বিষয়গুলি লুকিয়ে থাকে সে সম্বন্ধেও প্রত্যেকের একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

**(১)**

তিরিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে জন্মালেও অভিজিৎদার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ঢাকুরিয়ার ব্যানার্জী পাড়ার বাড়িতে। দাদা অরিন্দম ও অভিজিৎ ছিলেন পিঠোপিঠি ভাই। যে কারণে ছেলেবেলায় খেলাধুলো, মারামারি থেকে শুরু করে মায়ের কাছে মার খাওয়া সবেতেই তাঁরা ছিলেন জুড়িদার।

তখন তাঁরা বড় হয়েছেন। দাদা অরিন্দম গড়ে তুললেন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। নাম 'উদীচী'। এখানে লক্ষ্যনীয় এই নামকরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্র প্রভাব। আসলে ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মানোর সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত সহ এক রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁরা বেড়ে উঠেছেন। যে কারণে রবীন্দ্র চেতনার

আলোয় ছেলেবেলা থেকেই আলোকিত অভিজিৎদার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অন্যতম অবলম্বন। ব্রাহ্মরা মূর্তি পুজোয় বিশ্বাসী নয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ, সলিল চৌধুরী আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ত্রয়ীকে মনের গভীরে শালগ্রামশিলার মত প্রতিষ্ঠা দিয়েই অভিজিৎদার সংগীত জীবন এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। যাই হোক সেই 'উদীচী' সংস্থার সম্পাদক দাদা অরিন্দম থাকলেও সংগীত বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন অভিজিৎদা এবং দাদার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সুরকার প্রবীর মজুমদার। অভিজিৎদার বক্তব্য অনুযায়ী, "...ওখানে আমিই সবার ছোট হলেও এই 'উদীচী'ই আমার সুরকার জীবনের ভিত্তি।...একদিন বাড়িতে কিছু একটা করছি। হঠাৎ দাদার উদয়। এসেই হন্তদন্ত হয়ে একটা গানের কথা আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার এই লেখাটায় সুর কর তো!' আমিই বললাম, 'ধুর আমি কি সুরকার নাকি?' দাদা মানবে না কিছুতেই। ওঁর চাপে শেষে সুর করলাম। কিন্তু তা শুনতে একেবারেই যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। কিছুদিন পরেই দাদা সত্যেন দত্তর 'ছিপখান তিন দাঁড়' কবিতা নিয়ে এসে বললো তাতে সুর বসাতে। আমি তো বলেই ফেললাম, 'এতে আবার সুর হয় নাকি?' দাদা বললো, 'আমি বসছি তোর সঙ্গে, তুই কর।' অদ্ভুত ব্যাপার, সেদিন খুব কম সময়ের মধ্যেই সুরটা হয়ে গেল। এই ঘটনা 'পালকি চলে'র বছর দুয়েক আগেকার। প্রবীরদার সৌজন্যে এই গান সলিল চৌধুরী শুনেছিলেন। বলতে গেলে তারপরেই ওঁর কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই ও স্নেহধন্য হই। এই 'ছিপখান তিন দাঁড়' শুনেই সলিলদা স্থির করেছিলেন এই গান রেকর্ড করতে হবে। শুধু স্থির করেই থেমে থাকেননি। তৎকালীন গ্রামাফোন কম্পানির কর্ণধার ক্ষিতীশ বসুর সঙ্গে গানটি রেকর্ড করবার বিষয়েও পাকা কথা বলে আসেন। এরপরে সলিলদা চলে গেছেন মুম্বাই। তখন আমি একেবারেই নতুন। ক্ষিতীশবাবু সেই সময়ের এক প্রখ্যাত শিল্পী যিনি শাস্ত্রীয় সংগীতেও সুদক্ষ ছিলেন তাঁকে দিয়ে গানটা গাওয়াবেন ঠিক করেন। সলিলদা মুম্বাই থেকে ফিরে একথা শুনে বেশ চটে গেলেন। কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই। যাইহোক পরে সলিলদার মধ্যস্থতাতেই শিল্পী হিসেবে নির্বাচন করা হল শ্যামল মিত্রকে। এখানেই শেষ নয়। তখন আমি চাকরি করি। শ্যামলদার সঙ্গে টাইম ঠিক করে নির্ধারিত এক শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ গিয়ে দেখি শ্যামলদা বেরিয়ে যাচ্ছেন। বললাম, শ্যামলদা গান নিয়ে বসবেন না? শ্যামলদা বললেন, 'গান তুলে নিয়েছি।' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কে তোলালো? বললেন, 'সলিলদা'।" একটু থামলেন অভিজিৎদা। মিটি মিটি করে হাসি ছড়ানো মুখ নিয়ে বললেন, 'কি ভাবছো? ভাবছো তো এখানেই শেষ। কিন্তু তা নয়। সেই রেকর্ডিং-এ সলিলদা নিজে অরগ্যানও বাজিয়েছিলেন। ভাবতে পারো! আজকে তোমার কোনো রেকর্ডিং ফ্লোরে অন্য কোনো সুরকার বা অ্যারেঞ্জার নিজের ইচ্ছায় এসে কোনো যন্ত্র বাজাচ্ছে!"

জবাবহীন আমি দেখছি অভিজিৎদার উজ্জ্বল মুখে লালচে আভা ফুটে উঠেছে। চিকচিক করছে ওঁর দুটো চোখ। আমার দিকে কয়েক পলক নীরব তাকিয়ে আবার শুরু করলেন, "আজ যখন এইসব কথা ভাবি চোখে জল চলে আসে। কত বড় মাপের মানুষ। অথচ কতো কাছের জনের মতো ভালোবেসেছেন। কমিউনিটি লিভিং এবং কো-অপারেটিভ ক্রিয়েশান বিষয়টাও শিখেছিলাম সলিলদার কাছেই। এই গানেই তার দৃষ্টান্ত আছে।"

- "কিরকম?"

- "দেখবে গানটির দ্বিতীয় অংশে মাঝি মাল্লাদের সমবেত ধ্বনি ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাইরিয়া নাইরিয়া নানা তাইরিয়া নাইরিয়া' সুর সমেত এই পুরো ব্যাপারটা প্রবীরদার(প্রবীর মজুমদার)মস্তিস্কপ্রসূত। অথচ গানের সুরকার আমি। শিল্পের প্রয়োজনে শিল্পীদের মধ্যে এই ধরনের নিঃস্বার্থ সমবেত প্রয়াসের পেছনে সবথেকে বড় অবদান ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা এবং সলিল চৌধুরীর"।

(২)

নব্বই-এর দশকের একটা সময় আমাদের বাংলায় নতুন গানের বেশ আকাল চলছে। মানে গান হচ্ছে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে গান সেভাবে চলছে না। তখন সুমন চট্টোপাধ্যায় মানে বর্তমানে যিনি কবীর সুমন নাম নিয়েছেন, তিনি তাঁর লেখা, সুর করা এবং যন্ত্রানুসঙ্গ সহ নতুন বাংলা গান নিয়ে বাজারে এলেন। বাংলা গানের ধারায় সে যেন এক নতুন স্রোত। বাংলা গানের মূল ধারার থেকে অনেকটাই ভিন্ন সেই গানের ধারা। ক্রমশ গীতি কবিতা ব্যাপারটা উধাও হতে শুরু করল। বাংলা জুড়ে নব্য কবিরা জেগে উঠলেন। শুরু হল কবিতায় সুরারোপ। চারিদিকে গিটার কাঁধে ছেলেমেয়েদের ভিড়। গান-বাজনা যে একটা শিক্ষামূলক জিনিস, তা যে অনেক সাধনার ফল – এই ধ্যানধারনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে 'গান ভালোবেসে গাই'এর দল একক ভাবে বা ব্যান্ডের আকারে বাজারে নেমে পড়ল। সুমনের আনা গানের সেই ধারা 'জীবনমুখী গান' নামক নতুন আখ্যা পেল।

'জীবনমুখী গান' এই নামকরণ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে তখন বিতর্কের ঝড়। এমন সময়ে একদিন অভিজিৎদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই বিষয়ে তাঁর অভিমত কী?

উত্তরে বলেছিলেন, "কি বলবো বলতো! জীবনকে নিয়েই তো সমস্ত শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু এই যে শ্রেণি বিভাজন করা হচ্ছে, যে শিল্পসৃষ্টিতে সমাজের বা মানব জীবনের বিপন্নতার কথা থাকবে সেটাই শুধু 'জীবনমুখী' এ আমি বিশ্বাস করিনা। যে গানে বা যে চিত্রকলায় বা যে ছবিতে মানুষের মনের ভাবের বিষন্নতা বা উপলব্ধির তরঙ্গ ব্যক্ত হবে সেটা জীবনবেদ নয় এই অভিমত শিল্পসৃষ্টির অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মনে হয় 'জীবনমুখী গান' এই অভিধা অর্থহীন। পাশাপাশি গানের ভিতর দিয়ে জীবনের বা সমাজের অবক্ষয়ের অবস্থাকে চিত্রায়িত করবার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাবো। তবে মানুষের ভালবাসার গান জীবনের কথা নয়, এই অভিব্যক্তি নিরেট প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মধ্যেই থাকে স্রষ্টার জীবনবোধের অভিব্যক্তি। 'জীবন' একটি মহান শব্দ।" এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল 'সুমনের গান'-এর প্রসঙ্গ। সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, "দেখ, এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি প্রখ্যাত সমালোচক শ্রী নারায়ণ চৌধুরীর একটি অভিমতের কথা বলব। তিনি লিখেছিলেন, "প্রত্যেক সার্থক স্রষ্টাকে যুগানুগত্য মানতে হয়।" এখনকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে চোখ মেললেই দেখা যাবে জনজীবন সামগ্রিক ভাবে বিপন্ন। পেট থেকে প্রেম সব কিছুর জন্যই চলছে নিরন্তর লড়াই। এই স্পর্শকাতর বিষয়কে যে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে তুলে ধরবেন, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি গ্রহণীয় হয়ে উঠবেন। একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে শিল্পীমহল এই দিকটার ব্যাপারে ভীষণ রকমের উদাসীন ছিলেন। এমনই এক শূন্যতার মধ্যে তাঁর নিজের গান নিয়ে এলেন – সুমন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সংগীতে উঠে এলো সেই সময়ের সামাজিক চিত্র। মানুষ তাঁকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ভাবে আমার একটা বিষয় খামতি মনে হয়েছিল।"

- "সেটা কী?"

- "সেটা হ'ল ওঁর গানের প্রকাশে বিদেশি ছাপ।"

- "ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন।"

- "দেখ, তুমি তো নিজে শুধু গান-বাজনা করো না। তা নিয়ে গবেষণাও কর। পড়াশোনাও কর। আমাদের দেশের গানে বিদেশি যা কিছু মেশাতে যাও তাকে যদি আগে দেশজ না করে ফেলতে পার তবে তা সাময়িক গ্রহণীয় হলেও অদূর ভবিষ্যতেই তার স্থায়ীত্ব ফিকে হতে থাকে। যেমন ধরো সলিলদার সুরে তালাত মাহমুদের 'ইতনা না মুঝসে তু প্যায়ার'। এই গান শুনলে কি মনে হয় যে তুমি মোৎজার্টের সিম্ফনি শুনছো। কখনই মনে হবে না। কারণ প্রয়োগের গুণে তা তখন হয়ে গেছে দেশজ।"

অভিজিৎদার সঙ্গে এই কথা যখন হয়েছিল তখনও 'জীবনমুখী গান' আর ব্যান্ডের গানের বাজার

ছিল বেশ তুঙ্গে। কিন্তু এই কয়েক বছরের মধ্যে আজকে সেই সব গানের বাজার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় প্রবীণ সুরকারের ভাবনা কতটা বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

**(৩)**

সিস্টার নিবেদিতার লেখা 'দ্য জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্য' গল্পে আমরা দেখি একটি রাখাল বালক যখন বিক্রমাদিত্যের মাটিচাপা সিংহাসনে বসে তখন তার মধ্যেও যেন এক ন্যায়াধীশ রাজার ভাবের উদয় হয়। অগ্রজদের অবর্তমানে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয়তো অভিজিৎদাও করতে পারতেন। কিন্তু শুধু আমি নই কখনও কেউ তাঁর মধ্যে সেই ভাবের প্রকাশ দেখেছেন বলে আমার অন্তত মনে হয় না।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে যে আজীবন একেবারে আলাদা আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। ওঁর কথায়, যখন থেকে 'পুজোর গান' বিষয়ে জানতে পেরেছেন তখন থেকেই তাঁকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে হেমন্তের গান। ঢাকের আওয়াজ আর হেমন্তের গান এই দুই মিলেই তাঁর মনে পুজোর আসল সুর বেজে উঠত।

হেমন্ত শতবর্ষ উপলক্ষে আমি তখন ইউটিউবের জন্য 'হেমন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামে একটা সিরিজ বানাচ্ছি। সেই ব্যাপারে অভিজিৎদার বাড়ি গেছি। তখনও লকডাউন শুরু হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে মানুষ হেমন্তদা কেমন ছিলেন বলতে গিয়ে বললেন, "দেখ, শিল্পী তো কম দেখলাম না। কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁকে, বাস্তবকে প্রাধান্য দিয়ে চলা শিল্পী আমি কম দেখেছি। শিল্পীদের একটু নাম হলেই 'মাটিতে পা না পড়া' যে মনোভাব অনেকের মধ্যেই দেখা যায় হেমন্তদা ছিলেন তার একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ। প্রথম জীবনে যখন পরিচয় হল একেবারে শুরুতেই বললেন, "টিউশান করো? জানবে টিউশানই লক্ষ্মী। আমিও করতাম। না করলে বাঁচবে না। কলকাতায় শিল্পীর যদি অনেক ফাংশান থাকে তাহলে কিছু রোজগার হয়, নাহলে টিউশান করা ছাড়া উপায় নেই।" নির্বাক শ্রোতা হয়ে আমি শুনছি। আর অভিজিৎদা বলে চলেছেন অনুজের প্রতি হেমন্ত মুখার্জীর পরামর্শ, "একটা ছোট গাড়ি কিনে নেবে। তাতে সময়ও বাঁচবে। আর টিউশান বাড়িতে সম্মানও বাড়বে।"

আমি জানতে চেয়েছিলাম, "আপনি শুনেছিলেন সেই পরামর্শ?"

- "হ্যাঁ, আমি গাড়ি কিনেছিলাম। ওই মাপের শিল্পীর দূরদর্শিতার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাও মনে রাখার মত।"

- "একটু বলুন সেই ব্যাপারে।"

- "তখন আমার সুরে ওঁর 'সবাই চলে গেছে', আর উল্টোদিকে 'এমন একটা ঝড় উঠুক'-এর রেকর্ড প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশের দিন পনেরো পরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে এমন সময় ওঁর বাড়ি গেছি। ঘুমোচ্ছিলেন। আমায় দেখে বললেন, "ও তুমি! তোমার গান খুব ভালো হয়েছে। দশ বছর।" আমি হাসলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবছি, উনি কি জ্যোতিষ নাকি? এই সবে গান প্রকাশ পেল, আর উনি বলে দিচ্ছেন ১০ বছর চলবে? সত্যিই তো সেই গান আজও চলছে। আজও 'এমন একটা ঝড় উঠুক' রিমেক করছেন শিল্পীরা।"

অভিজিৎদাকে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ, সলিল চৌধুরী আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই বড় বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। যেন যা বলছেন তাতে উনি ওঁদের বিষয়ে যতটা যা বলতে চাইছেন তা ঠিক মত প্রকাশ পাচ্ছে না।

হেমন্ত বিষয়ে আলোচনায় একদিন বললেন "গায়ক তো অনেকেই হন। বয়সে বড়ো অনেকেই থাকেন। কিন্তু হেমন্তদার মত অভিভাবকসুলভ মন আমি দেখিনি। ওঁর কিছু কিছু কাজকর্মের ধরন দেখে মনে হয়, উনি যেন সবার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন।"

- "একটু বিশদে যদি বলেন।"

- "কত উদাহরণ দেব! আমার ক্ষেত্রেই তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আছে।"

- "আপনার ক্ষেত্রে?"

- "হ্যাঁ। সেবার পুজোয় আমার সুরে হেমন্তদা গাইবেন। সব ঠিকঠাক। প্রথমে ঠিক হ'ল মুম্বাইতে রেকর্ড করা হবে। আমি চলে গেলাম মুম্বাইতে। কিন্তু হেমন্তদার ব্যস্ততার কারণে সেখানে রেকর্ড হল না। চলে এলাম কলকাতায়। এর মধ্যেই কিছু একটা কারণে হেমন্তদা আমায় লিখে পাঠালেন যে এবার আমার সুরে গান হবে না। পরের পুজোয় আমার গান করবেন। আমি তো এক্কেবারে ভেঙে পড়লাম। তখন পরিচিত মহল থেকে শুরু করে অনেকেই জেনে গেছেন যে পুজোয় হেমন্তদা আমার সুরে গাইবেন। আমি ওঁকে লিখলাম, আপনার তো হারাবার কিছু নেই। কিন্তু অনেকের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাওয়াতে কাজটা না হলে আমার প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। সেই চিঠি পেয়েই ফোন করে জানালেন যে এক পিঠে আমার 'অনেক অরণ্য পার হয়ে' থাকবে আর এক পিঠে মুকুল দত্তের কথায় হেমন্তদার নিজের সুরের 'আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব' থাকবে। কিন্তু সুরকার হিসেবে দুটো গানেই আমার নাম থাকবে। হলও তাই। আমি রয়্যালটিও পেলাম। কিন্তু ব্যাপার কি জানো তো! আমিও তো একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। তাই যখনই কেউ আমাকে বলেছেন, 'আমিও পথের মতো' দারুণ সুর করেছেন – আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে যেত। একটি আন্তরিক পাওয়া থেকেও যে কতখানি বেদনার সৃষ্টি হতে পারে এই গানটা আমাকে বারংবার সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করিয়েছে। এই বিবেকহীন, প্রেমহীন যুগে এসব কথা বলতে চোখে জল আসে।

(৪)

আর এক কিংবদন্তী মান্না দে অভিজিৎদার সুরে আধুনিক গান না গাইলেও বেশ কিছু ছায়াছবির গান গেয়েছেন। যার অধিকাংশই হিট হয়েছে। মান্না দে বিষয়ে বলতে গেলে বলতেন, "মান্না দে-র গানকে বুঝতে গেলে তাঁর সাংগীতিক পটভূমিকাটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। নাহলে তাঁর গানের যে প্রকাশ বা ঐতিহ্য তার কিছুই বোঝা যাবে না। শাস্ত্রীয় সংগীতই তো গানের বুনিয়াদকে সমৃদ্ধ করে। আর মান্না দে সেই সংগীতকে শুধু যে সঠিক ভাবে শিখেছেন তাই নয়। সেই শিক্ষাকে তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে আধুনিক জীবনে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন সংগীত বিষয়ের এক মস্ত পণ্ডিত। তাঁর কাছেই মান্না দে ধ্রুপদ শিখেছেন। এছাড়াও নানা ওস্তাদের কাছে তিনি তালিম নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনায়াসে গাইতে পারতেন – 'জীবনে কি পাবো না'র মত গান।"

একদিন অভিজিৎদার কাছে মান্নাদার সঙ্গে ওঁর কাজেরও কিছু অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে অভিজিৎদা বলেছিলেন, 'জীবনরহস্য' ছবিতে মান্নাদা আমার সুরে দুটি গান গেয়েছিলেন। 'পৃথিবী তাকিয়ে দেখ' আর 'কে তুমি, কে তুমি শুধুই ডাকো' দ্বিতীয় গানটার শুরুতে একটা স্বরগম ছিল। সেই স্বরগমের সঙ্গে গানের রাগের কোনও মিল নেই। আমার মনে একটু দ্বিধা ছিল। কারণ আমি জানতাম উনি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। আসলে আমি অনিয়মের মধ্যে দিয়ে একটা সৌন্দর্য প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। বিচক্ষণতা দিয়ে সেটা নিশ্চয়ই উনি অনুভব করেছিলেন। যে কারণে একবারও বলেন নি, "ও মশাই, এটা কি করলেন?" বরং মনের মধ্যে কোনও সঙ্কীর্ণতা না রেখে কী অসাধারণ যে গেয়েছিলেন, তা আজ প্রত্যেকেই জানেন।"

এই মান্না দে-রই আর একটি ঘটনা অভিজিৎদার কাছ থেকে শুনেছিলাম। 'তিলোত্তমা' ছবির 'গোলাপের অলি আছে' গানের রেকর্ডিং হচ্ছে। সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। গায়ক মান্না দে। মিউজিক অ্যারেঞ্জার অলোকনাথ দে। অভিজিৎদা 'বি ফ্ল্যাট'-কে সা করে সুর করেছিলেন। কিন্তু অলোকনাথ দে মিউজিক করলেন 'ডি'-কে সা করে। গায়ক মান্না দে-ও সেই 'ডি'কে সা ধরেই গানকে গেঁথে নিলেন মনে। তারপর একদম কাওয়ালি স্টাইলে সেই গান নিয়ে তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী সহ অন্য সব যন্ত্রীদের নিয়ে গাইতে থাকলেন। অভিজিৎদা বলছেন, "আমি যতই বলছি মান্নাদা এবার রেকর্ড করি। উনি বলছেন, আরে দাঁড়ান মশায় আমায়

একটু ভাল করে গাইতে দিন। রাধাকান্ত নন্দী আর মান্নাদা দুজনে মিলে গানটাকে নিয়ে এমন ভাবে মেতে গেলেন যে আমার সেখানে যেন কোনও ভূমিকাই নেই। আসলে তখনকার শিল্পীরাই এমন ছিলেন। গান দিলে সেটা তাঁদের নিজের করে নিতেন। আর সেই জন্যই সে গান নিয়ে এতবছর পরেও আমরা আলোচনা করছি।" যতদূর মনে হয় এই গানটাই মান্না দে-র জীবনের শেষ সুপারহিট বাংলা ছবির গান।

আমার মনে আছে মান্না দে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিজিৎদা একদিন এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা আজও আমার মনে থেকে গেছে। ওঁর ভাষায়, "হি ইজ গ্রেট। কিন্তু আমার চিন্তা হয় যে মান্না দে বাংলা গানের সংগীত ইতিহাসে যে অমূল্য উপহার দিয়ে গেছেন তার কতটা বাংলার সংগীত সমাজ ও শ্রোতারা অনুধাবণ করতে পারেন! সেটা যদি তাঁরা পারেন তাহলে তো ভালই। না হলে সংগীত থেকেও যে জীবনরস গ্রহণ করতে পারে এ বোধ থেকে তাঁরা নিজেরাই বঞ্চিত হবেন।" এরপরে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন যে, "তুমি বা আমি বা আমাদের মত আরও কেউ যারা ওঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করতে পেরেছি তারা ভাগ্যবান। আর তুমি তো ওঁর জীবনের প্রায় শেষ দিন অবধি একেবারে কাছের মানুষ হিসেবেই ছিলে। সেটাও কি কম সৌভাগ্যের?"

(৫)

অনেক অনেক স্মৃতি। অনেক মতান্তর। অনেক স্নেহ। অনেক ভালোবাসা। সেগুলোই রয়ে যাবে। রয়ে যাবে তাঁর সৃষ্টি। একটা নির্দিষ্ট দর্শন ছিল। একটা নির্দিষ্ট ভাবনা ছিল। সবার সঙ্গে হয়তো মিলতো না। কিন্তু গিরগিটির মত 'ভোল' পাল্টাননি।

অভিজিৎদার সঙ্গে আড্ডা বা সময় কাটানোর মুহূর্তগুলোকে সময়ের বিচারে পরিমাপ করা যায় না। এই মুহূর্তগুলো শুধুই অনুভবের। যেখানে নেই কোনও লেনা-দেনা। নেই কোনো তথাকথিত সমালোচনা। নেই কোনো আত্মতুষ্টির অহংকার। নেই কোনো না পাওয়ার হতাশা। সেই সময়ের অধিকাংশটাই কেটেছে শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে কিছু আলোচনায়। আলোচনায় এসেছেন সলিল চৌধুরী। এসেছেন হেমন্ত মুখার্জী। এসেছেন মান্না দে। এসেছেন আরও অনেকেই। এসেছে তৃণমূল, এসেছে বি জে পি, এসেছে সি পি এম। এসেছে সংসার, এসেছে বৈরাগ্য।

মনের মধ্যে আশার আলো জ্বেলে চলে এসেছি কলকাতার বাইপাস-এর পথ ধরে। দু দিকে সরে সরে গেছে উন্নয়নের নানা ছবি-পোস্টার। আর মনের মধ্যে উথাল পাতাল করেছে আমাদের মূল্যবোধের উন্নয়নের দীনতার কথা। স্বর্ণযুগের সুরকারদের মধ্যে একমাত্র জীবিত, প্রাণস্পন্দনে ভরপুর মানুষটির কি যথাযথ মূল্যায়ন হল?

জ্বলে থাকা টিমটিমে আশার প্রদীপ একেবারেই নিবে গেল আজীবন সাহিত্য সংগীতকে আঁকড়ে থাকা সৃষ্টিশীল, জীবনবোধে ভরপুর মানুষটির অনাড়ম্বর শেষ যাত্রা দেখে। প্রবাদে আছে 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। এ কেমন ভাল? নীরবে মুছে গেল স্বর্ণযুগের সুরকারের শেষ সাক্ষর। এমন এক গুণীজনের শেষ বিদায়ের দৃশ্য মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। আজকের এই গানহীন পেখমধারী সমাজে একটা 'হংস পাখা দিয়ে' আর একটা 'অনেক অরন্য পার হয়ে' ই কি যথেষ্ট নয়? বাদই দিলাম 'ও পাখি উড়ে আয়' বা 'সারাদিন তোমায় ভেবে'র মত অজস্র গানের কথা। নাকি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেতে গেলে আজ 'টেলিভিশন খ্যাত' হওয়া অবশ্য প্রয়োজন? দিনটি ছিল 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস'। অথচ বাংলার সংগীত সমাজ সেদিন বাংলার এক গৌরবের মৃত্যুতে বাক্যহীন থেকে গেলেন!

সলিল চৌধুরীর অলিখিত শিষ্যদের মধ্যে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বেসিক রেকর্ডে বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া অজস্র হিট গানের কারিগর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তালিকায় আছে সুবীর সেন এর 'সারাদিন তোমায় ভেবে', 'নয় থাকলে আরো কিছুখন'। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের 'সাতনরি হার দেব', 'হাজার মনের ভিড়ে'। নির্মলা মিশ্রের

'বলো তো আরশি', 'কেন এই গান গাওয়া'। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ওই আকাশে ক্লান্তি নেই', 'তোমার দু চোখে আমার স্বপন আঁকা'। বনশ্রী সেনগুপ্তের 'এর বেশি কিছু চাই না'। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর 'যা ছিলাম তাই আছি'। বাসবী নন্দীর 'এ শুধু তোমার আমারে লয়ে' সহ কত অজস্র গান। যে গান না গাইলে হৈমন্তী শুক্লা আজও মঞ্চ থেকে নামতে পারেন না সেই 'এখনো সারেঙ্গীটা বাজছে' গানের সুরও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছায়াছবিতে প্রথম সুরকার হিসেবে কাজ করেন ১৯৬৬ সালে। অমল দত্ত পরিচালিত সেই ছবির নাম 'অশ্রু দিয়ে লেখা'। ছবিতে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমল দত্তের লেখায় গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র। এরপরে যে সমস্ত ছবিতে তাঁর সুরের গান হিট হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হারায়ে খুঁজি' ছবিতে আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'টুংটাং পিয়ানোয় সারাটি দুপুর', 'সেলাম মেমসাহেব' ছবিতে মান্না দের গাওয়া 'ঝরনা ঝর ঝরিয়ে', 'জীবন রহস্য' ছবিতে আশা ভোঁশলের গাওয়া 'ও পাখি উড়ে আয় উড়ে আয়', 'যদি কানে কানে বলে বঁধুয়া', 'সন্ধি' ছবিতে পিন্টু ভট্টাচার্যের গাওয়া 'আসা যাওয়ার পথের ধারে', বিজয় বসু পরিচালিত 'সাহেব' ছবিতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'কত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়', 'মৌন মুখর' ছবিতে কিশোর কুমারের গাওয়া 'সেই তানপুরা আছে ছিঁড়ে গেছে তার', এইভাবে তালিকা বাড়াতে থাকলে বাড়তেই থাকবে। 'তিলোত্তমা' ছবিতে মান্না দে ও অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর গাওয়া 'রঙ শুধু দিয়েই গেলে' আজও দোল উৎসবে গাওয়া হয়।

এখনকার শ্রীকান্ত, শম্পা কুণ্ডু, মনোময়, রাঘব, রূপঙ্কর সহ প্রায় প্রত্যেকেই এই কিংবদন্তীর সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। যুগের পরে যুগ ধরে যে মানুষটি বাংলার সংগীত জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর মৃত্যু যে এক বিরাট শূন্যতা এনে দিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি বলতেন, "দীর্ঘ জীবন মানেই, দীর্ঘ দুঃখ আর সন্তাপের ভাগিদার হওয়া।" আসলে আমাদের দেশে বিশেষত বাংলায় সুরকার, গীতিকার বা যন্ত্রশিল্পীদের জীবন বেশ কষ্টের। সাংস্কৃতিক হেরিটেজ কে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা অভিজিৎদা প্রায়ই বলতেন, "বাণিজ্যিক চাপে বর্তমানে আর্ট কোণঠাসা। আমাদের মত যারা শিক্ষকতা করেন, বা গানের নির্মাতা, বিচার বিশ্লেষণ বা সামান্য গবেষণার কাজে জড়িত আছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই হয় কর্পোরেট চাপ সহ্য করছেন আর নাহলে বুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের অধীনতা সহ্য করছেন। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ স্রষ্টাকেই এই দুইয়ের পদতলে বলি দিতে হচ্ছে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল শিল্পসত্তাকে। ফলত সুস্থ সুন্দর শিল্পের, সংগীতের সৃষ্টি আজ প্রায় বন্ধের মুখে। ... সার্থক নাটক, সংগীত, নৃত্য, কবিতা যা একদিন সৃষ্টি হয়েছিল স্রষ্টার উপলব্ধির উৎস থেকে তাকে কলমের ডগা দিয়ে আর ব্যবসায়িক চাপে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।..."

আজ অভিজিৎদা নেই। ওঁর এই কথাগুলো প্রায়ই মনে পড়ে। মনে পড়ে ওঁর অসহায় অভিব্যক্তিগুলো। তখন ভাবি এই ধরনের কথা বলবার মত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমতে কমতে এখন প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'আগন্তুক' ছবির সেই দৃশ্য। যেখানে 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ' গাইবার পরে উৎপল দত্ত বলছেন, 'কে দেবে আলো, কে দেবে প্রাণ'। এর সঠিক উত্তর কি কারো জানা আছে?

# সব্যসাচী সংগীত ব্যক্তিত্ব বাপি লাহিড়ী

**সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত**
বেতার উপস্থাপক, ছায়াছবির গানের গবেষক

কলকাতা ও মুম্বাই-এর একসময়ের জনপ্রিয় সংগীত ব্যক্তিত্ব অপরেশ লাহিড়ী এবং শাস্ত্রীয় সংগীত ও শ্যামা সংগীতের দক্ষ শিল্পী বাঁশরী লাহিড়ীর একমাত্র সন্তান অলোকেশ ওরফে বাপি লাহিড়ী একজন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী কালজয়ী সুরকার, সংগীত পরিচালক এবং কণ্ঠশিল্পী। ভারতীয় সংগীতের জগতে, বিশেষ করে বলিউডের ছায়াছবির গানের জগতে যাঁকে অবিসংবাদিতভাবে 'ডিস্কো কিং' অভিধায় ভূষিত করা হয় তিনি বাপি লাহিড়ী। তবে তাঁর দীর্ঘ সংগীত জীবনের পথ-পরিক্রমার নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে অনুভব করা যায়---তিনি শুধু 'ডিস্কো কিং' নন, একজন সংবেদনশীল 'মেলডি মেকার'ও। তাঁর সুরারোপিত সংগীত অসাধারণ বৈচিত্র্যে ভরপুর যা ঋদ্ধ করেছে বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবির গানের জগতকে। এখানে স্বল্প-পরিসরে বাপি লাহিড়ীর বাংলা গানের ওপরেই মূলত আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

অপরেশ ও বাঁশরী লাহিড়ীর সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে তবলায় শিশুপুত্র বাপি

শৈশব থেকে সাংগীতিক আবহে বেড়ে ওঠা বাপি প্রথম সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দাদু' ছায়াছবিতে। পরবর্তী ছায়াছবি 'জনতার আদালত' (১৯৭২)। বাংলা ছায়াছবির গানে বাপি তাঁর স্বাক্ষর রাখলেন 'ওগো বধূ সুন্দরী' (১৯৮১) সিনেমায়। উপহার দিলেন একের পর ভিন্নস্বাদের গান। 'ও ড্যাডি ও মাম্মি', 'এই ডুগ ডুগ ডুগডুগ দেখো বাবু খিলা দেখো রে' এবং 'তুই যতো ফুল দিস না কেনে বকুল যদি না দিস এনে আমি তোর কোনো কথা শুনবো না' নারীকণ্ঠে গীত এই তিনটি গানের সুরের বৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। অন্যদিকে কিশোর কুমারের গাওয়া 'এই তো জীবন যাক্ না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ', 'শুধু তুমি নয় অবলাকান্ত' আর 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' তিনটি তিন ধারার গান। বাপি লাহিড়ীর স্বকণ্ঠে গাওয়া রোমান্টিক গান 'মালবিকা অনামিকা'ও অত্যন্ত সাফল্য পেয়েছিল। বাপির পরবর্তী বাংলা ছবি 'প্রতিদান' (১৯৮৩)-এর প্রতিটি গান উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। পৃথকভাবে লতা মঙ্গেশকর এবং বাপির নিজের গাওয়া ঈশ্বরচেতনা মূলক গান 'মঙ্গল দীপ জ্বেলে' আজও জনপ্রিয়। সেইসঙ্গে দর্শক শ্রোতা এখনো মনে রেখেছেন কিশোর কুমারের কণ্ঠের কাহিনী-ধর্মী সংগীত 'সে এক রাজার ঘরে রাতদুপুরে ডাকাত এলো তেড়ে'।

১৯৮৪তে বাপি লাহিড়ীর সংগীত পরিচালনায়

মুক্তি পায় 'দুজনে'। আশা ভোঁসলে গেয়েছিলেন এককভাবে 'প্রেম কিসে হয় তা কেউ কি জানে' এবং বাপির সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে 'বলো তো কী করে ঘর বাঁধা যায়' ও 'ঐ নীল পাখিটাকে ধরে দাও না'। সুরের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছিল গানগুলি। এই ছবিতেই কিশোরকুমারের কণ্ঠে বাপি দিয়েছিলেন আরো একটি বিখ্যাত গান 'জোরে চলো জোরে চলো আরো, জোরে জোরে চলো জোরসে' যা সুরের অভিনবত্বে অনন্য মাত্রা লাভ করেছিল। 'অন্তরালে' (১৯৮৫) ছায়াছবিতে কিশোরকুমারের গাওয়া 'আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো' আজো মানুষ লিখে রেখেছেন মনের খাতায় গানটির সুরমাধুর্যের কারণে। ১৯৮৬তে মুক্তি পায় 'উর্বশী'। তার ঠিক পরের বছর তিনটি ছায়াছবিতে বাপি তাঁর দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন—'অমরসঙ্গী', 'প্রতিকার' এবং 'গুরুদক্ষিণা'। 'অমরসঙ্গী'র 'চিরদিনই তুমি যে আমার' গানটির দুটো ভার্সানই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, গেয়েছিলেন কিশোরকুমার এবং আশা ভোঁসলে। 'গুরুদক্ষিণা' ছায়াছবির গান খ্যাতির চরমবিন্দু স্পর্শ করেছিল তা প্রায় সকলেরই জানা। এ-প্রসঙ্গে পাঠকদের সামনে অজানা একটি তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস রাখছি যা বাপীদার কাছে স্বকর্ণে শোনা। মুম্বই-এর মেহবুব স্টুডিওতে রেকর্ডিং চলছে। 'কোথা আছো গুরুদেব আমি জানি না' গানটি রেকর্ড হয়ে যাবার পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কিশোর কুমার। হঠাৎ বাপির যন্ত্রশিল্পীদের তোলানো একটি গান তাঁকে আকৃষ্ট করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিশোরকুমার সম্পর্কে বাপির মামা ছিলেন। কৌতূহলী হয়ে কিশোর জানতে চাইলেন—'এ গান কে গাইবে বাপি? এ তো দারুণ গান। হিট হয়ে যাবে'। বাপি সবিনয়ে উত্তর দিলেন— 'মামা, আমি গাইবো ভাবছি'। কিশোর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন গানটি তিনিই গাইবেন। বাংলা ছবির বাজেটের অপ্রতুলতার কথা বলে বাপি তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন, ছুটে এলেন প্রযোজক। কিশোর দুজনকেই আশ্বস্ত করে গাইলেন কালজয়ী গান— 'এ আমার গুরুদক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম...'। 'নরানাং মাতুলক্রম'—কিশোর এবং বাপির মেলবন্ধনে বাংলা ছায়াছবির গান অনন্য উচ্চতা পেল। এ ছবিতেই মহম্মদ আজিজের কণ্ঠের 'পৃথিবী হারিয়ে গেল মরু সাহারায়'—এই জীবদর্শনের গানটি বাপি দিলেন নায়ক নয়, খলনায়কের ওষ্ঠে। তবু গানটি ব্যাপক প্রসারতা পেল। সংগীত পরিচালকের দূরদর্শিতা হল প্রমাণিত।

বাংলা ছায়াছবির গানের সর্বাধিক খ্যাতনামা জুটি কিশোরকুমার ও আশা ভোঁসলের নেপথ্য কণ্ঠসংগীতের মাধ্যমেই বাপি লাহিড়ী সুরারোপিত গানগুলি সেযুগে আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শুধু বিশেষ কোনো শ্রেণি নয়, পৌঁছে গিয়েছিল সর্বস্তরের সংগীতপ্রেমী মানুষের কাছে—এখানেই বাপির অনন্যতা। সাধারণ দর্শকের চাহিদা ও স্পন্দনকে অনুভব করে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে পরিবর্তন করেছেন তিনি, বার বার অতিক্রম করেছেন নিজেকেই। স্নিগ্ধ সুরের ঝর্ণাধারায় শ্রোতাদের যেমন স্নাত করেছেন তিনি তেমনি ডিস্কোর ঝংকারে মাতিয়েছেন নবীন প্রজন্মকে। আশির দশকে বাংলা তথা ভারতীয় সংগীতে ডিস্কোর সংমিশ্রণ ঘটে মূলত বাপি লাহিড়ীর হাত ধরে। ১৯৮২ সালে মুক্তি পায় 'ডিস্কো ডান্সার' হিন্দি ছবি, বাপি লাহিড়ী আর ডিস্কো যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। বাংলা ছবিতে বাপির স্বকণ্ঠে এবং ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে গীত এ জাতীয় বেশ কিছু গান ছড়িয়ে পড়ে অলিতে-গলিতে, অন্দরে-বাহিরে। তবে বাপি এবং ডিস্কো প্রায় সমীকৃত হলেও মেলডি নির্ভর গান যে তিনি আর সৃজন করেননি তা কিন্তু নয়। চিরকালীন কিছু গানই তাঁর প্রকৃত শিল্পীসত্তাকে চিনতে সাহায্য করেছে। ছায়াছবির গানের সঙ্গেই বেশি নিবিড় বন্ধন ছিল তাঁর, বাংলা আধুনিক গান খুব বেশি পায়নি বাপি লাহিড়ীকে। তবে সুবীর হাজরার কথায়, বাপি লাহিড়ী সুরে 'তখন তোমার একুশ বছর বোধহয়' (১৯৮৮) যেভাবে চিরকালীন শ্রোতৃহৃদয় জয় করে নিয়েছে তা আমাদের চমৎকৃত করে।

বাপি লাহিড়ীর সংগীত পরিচালনায় ১৯৮৮ সালে মুক্তিলাভ করে চারটি ছায়াছবি—'অন্তরঙ্গ',

'আগুন', 'দেবীবরণ' এবং 'প্রতীক'। 'দেবীবরণ'-এ আশা ভোঁসলের কণ্ঠে 'গা ছমছম কী হয় কী হয়' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সংগীত পরিচালক হিসেবে তাঁর চাহিদা যে তখন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। তার ঠিক পরের বছর বাপির সুরে একে একে মুক্তি পায় 'নয়নমণি', 'আশা ও ভালোবাসা', 'আমার তুমি', 'অগ্নিতৃষ্ণা', 'চোখের আলোয়', 'অমর প্রেম', 'মঙ্গলদীপ', 'প্রণমি তোমায়', 'সংসার'। এক বছরে এতগুলো ছবির গানে সুর যোজনা করা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। 'আশা ও ভালোবাসা' এবং 'আমার তুমি'র শীর্ষ সংগীতদুটির সুরমূর্ছনা শ্রোতাদের আবিষ্ট করেছিল। অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল 'চোখের আলোয়' ছবির দুটি গান—আশা ভোঁসলের কণ্ঠে 'আর কত রাত একা থাকবো' এবং বাপি লাহিড়ী-কবিতা কৃষ্ণমূর্তির দ্বৈতকণ্ঠে 'ঐ শোনো পাখিও বলছে কথা'। 'রক্তঋণ', 'মন্দিরা', 'বদনাম', 'বলিদান' ছায়াছবির গান বাপি লাহিড়ীর সুরে প্রকাশলাভ করে ১৯৯০ সালে। 'মন্দিরা'য় লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গান 'সব লাল পাথরই তো চুনী হতে পারে না' কালাতিক্রমী। 'বলিদানে' ঊষা উত্থুপের কণ্ঠের 'প্রেম জেগেছে আমার মনে বলছি আমি তাই' গানে মজেছে তরুণ প্রজন্ম। ১৯৯১-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'অহংকার' এবং 'অন্তরের ভালোবাসা'র গান পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে না। এর পরের বছর বাপি লাহিড়ীর সুরে প্রকাশিত হয় 'রক্তে লেখা', 'আপন পর', 'অনুতাপ', 'সুরের ভুবন' এবং 'প্রিয়া'। 'রক্তে লেখা'য় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও বাপি লাহিড়ীর সুরে কবিতা কৃষ্ণমূর্তির কণ্ঠে গাওয়া 'আমি কলকাতার রসগোল্লা' এখনও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। 'রক্তের স্বাদ', 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ', 'দালাল' মুক্তি পায় ১৯৯৩ সালে। 'দালাল' ছায়াছবিতে কুমার শানু, অলকা ইয়াগনিক ও ইলা অরুণের গাওয়া গান এক শ্রেণির দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

শুধুমাত্র বাংলা আধুনিক বা ছায়াছবির গান দিয়ে বিচার্য নন বাপি লাহিড়ী। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে হিন্দি তথা ভারতীয় ছায়াছবির গানে তাঁর দীর্ঘকালীন অসামান্য অবদানের দিকটি স্মরণ করতেই হয়। যা এই প্রবন্ধের আলোচনার পরিসরের বাইরে রাখা হল।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, সুরের ওঠা-পড়া, মন্দ্রসপ্তক থেকে তারসপ্তকে অনায়াস স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, ছন্দ-বৈচিত্র্য বাপি লাহিড়ীর স্বকীয় এক সংগীতধারা সৃজন করেছে যা সাধারণ শ্রোতা থেকে শুরু করে সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী শ্রোতাদের কাছে এক অনন্য আবেদন নিয়ে পৌঁছে যায়। তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন একটি প্রতিষ্ঠান। সব্যসাচী এই সংগীত-প্রাণা মানুষটি একহাতে সাবলীলভাবে সৃজন করেছেন স্নিগ্ধ নরম শাশ্বত মেলডির ফল্গুধারা, অন্যদিকে যৌবন-আবেগে দীপ্ত ঝংকারময় ডিস্কো-ধর্মী সংগীত। তাঁর 'জিমি জিমি আজা আজা' দেশকালের সীমানা অতিক্রম করলেও বাপি লাহিড়ীকে অমরত্ব দিয়েছে কোমল সুধাময় সংগীত—'চলতে চলতে মেরে এ গীত ইয়াদ রাখনা, কভি আলবিদা না কহে না, কভি আলবিদা না কহে না...'।

অনুলিখন - **চিত্রা সরকার**

# স্মৃতিটুকু থাক

**শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়**
গায়ক ও সঙ্গীত গবেষক

28 September 1929 সুধামতি এবং দীননাথ মঙ্গেশকরের গৃহ আলো করে মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিকে কণ্ঠে ধারণ করে জন্মগ্রহণ করলেন হেমা মঙ্গেশকর। পরবর্তীকালে এই হেমা মঙ্গেশকরই ছিলেন বিশ্ববরেণ্য লতা মঙ্গেশকর। যিনি 'Queen of Melody', 'Nightingale of India', 'Voice of the Millenium' এর মতো অভিধা এবং 'দাদাসাহেব ফালকে' কিম্বা 'ভারতরত্ন' ভূষণে ভূষিতা। লতাজী কমপক্ষে ৩৬টি ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং তার মধ্যে English, Russian, Dutch & Swahili ছাড়াও মারাঠী, হিন্দি এবং বাংলা ভাষা রয়েছে। সাত দশক ধরে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বর সারা পৃথিবী ব্যাপী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। *Guinness Book of World Records*-এ তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। France-এর সর্বোচ্চ পুরস্কার 'National Order of the Legion of Honour' সালে লতাজী গ্রহণ করেন।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক, নজরুল মঞ্চ, ২০১৮

লতাজী সম্পর্কে বলতে গেলে যেটা বলতে হয় সেটা হল, লতাজী একটা অসাধারণ Magical Voice যেটা শুনলে কখনো দুচোখ জলে ভরে যায়, আবার কখনো ফেলে আসা জীবনের আনন্দঘন হারানো স্মৃতি যেন ভেসে উঠে। বাংলায় গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। মা সরস্বতী যেন দুভাগে বিভক্ত, একজন মুম্বাইয়ের লতাজী আর একজন বাংলার কোকিল কণ্ঠী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। দুজনের বন্ধুত্বও ছিল অপরিসীম। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একাধারে যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করতেন তেমনি লঘু সঙ্গীতও পরিবেশন করতেন। সঙ্গীতের ইতিহাসে বা ব্যাকরণে এই দুইয়ের মেল বন্ধন খুবই কঠিন কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অবলীলাক্রমে এবং খুব সহজ সরলভাবে তা উপস্থাপিত করতে পারতেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর কাছে তালিম প্রাপ্ত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত জগতের একটি বিশেষ নিদর্শন। এঁদের গান যেন কোথাও আমাদের ছেলেবেলা কিম্বা জীবনের প্রথম প্রেম অথবা হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে মনে করিয়ে

দেয়। অর্থাৎ তাঁদের গান আমাদের চিন্তনে মননে এতটাই রেখাপাত করে যে কোথাও যেন আমার উদাসী মন, সেই পৃথিবীতে চলে যায় যেখানে আছে শুধু শান্তি, আছে নিখাদ প্রেম, আছে ছেলেবেলায় মা-বাবার স্পর্শ। 'বঙ্গবিভূষণ' প্রাপ্ত এই শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য।

বরেণ্য সঙ্গীতজ্ঞ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করে সুরলোকে পাড়ি দিলেন। তাঁর লেখা গান বা তাঁর সুরারোপ করা সঙ্গীত আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। বহু শিল্পী তাঁর কাছে উপকৃত। সিনেমা জগৎ থেকে শুরু Basic Album এর যে সমস্ত হিট গান পারদর্শিতার সঙ্গে তিনি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন তাহা সঙ্গীতের ইতিহাসে লেখা থাকবে। মনে হয় সেগুলি যেন একটি মুক্তমালা— একটি গান একটি মুক্তাস্বরূপ। তিনি ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টিকে বুকে নিয়ে আমরা বাঁচবো। এ যে আমাদের অমূল্য সম্পদ।

যাঁরা শতবর্ষ পূর্ণ করলেন সেই সব শিল্পীও একটি যুগ কিম্বা কিংবদন্তী গায়ক। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য একাধারে সিনেমার গানে কিম্বা বাংলা গানের Basic Album-এর একজন মহীরুহ। আধুনিক বাংলা গান ছাড়াও তিনি শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিরসাশ্রিত গান রেকর্ড করে গেছেন। তখনকার কলকাতায় মানুষের ঘরে ঘরে বাজতো 'শিল্পী আমি আমায় তবু গাইতে হবে গান' Basic রেকর্ডের গান ছিলো কিম্বা 'মেজদিদি' ছবির অমর গান 'জনম মরণ'। সে যুগের গ্রামোফোনে গান শোনা আর সেই গানকে উপভোগ করাটা ছিলো গানের জন্যই গান শোনা। তাই আজও তাদের নিয়ে লিখতে বসে যেন তাঁদের দেখতে পাই, তাঁদের স্পর্শ পাই কিম্বা সামনে বসে যেন তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সঙ্গীত জগতের আর একজন মহীরুহ ১৯৩৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানিতে প্রথম রেকর্ড। এরপর একদিন হঠাৎই সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। মনে পড়ে গেলো বাংলা কাব্য সঙ্গীতের কথা। রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু ছিলেন বাংলাকাব্য সঙ্গীতের প্রথম প্রেমকাব্য রচয়িতা। মানবিক প্রেমের সঙ্গীতের তিনিই প্রথম প্রণেতা, তাই সে যুগে অন্ধ এবং মূঢ় কিছু বঙ্গসন্তান নিধুবাবুকে একঘরে করেছিলেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘটনাটি পড়লেন এবং নিধুবাবুর লেখা কাব্য সঙ্গীত দেখে অবাক হলেন। নিধুবাবুর গান ছিলো টপ্পা। শ্রী চট্টোপাধ্যায় সে যুগের বহু গুণীজনের কাছে টপ্পা গানের তালিম নিলেন।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় গাইছেন — নিধুবাবুর টপ্পা, তবলায় পুত্র শ্রীকুমার

পরবর্তীকালে এই টপ্পা গানকে সিনেমা ও রেডর্কের মাধ্যমে সঙ্গীত পিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। সত্যজিৎ রায় একবার তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন "রামকুমার আপনি বাংলা গানের একটি রুদ্ধদ্বার খুলে দিলেন"। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বহু শ্যামাসঙ্গীত এবং ভক্তি রসাশ্রিত গানও রেকর্ড করে গেছেন। তাঁর গাওয়া 'কাদের কুলে বউ' আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সঙ্গীতের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে SNA Award (Sangeet Natak Acadamy) পুরস্কার গ্রহণ করেন।

একটি যুগ সৃষ্টিকারী Music Director বাপ্পি লাহিড়ী চলে গেল। মাত্র ৬৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করলেন বাপ্পি। মুম্বাইয়ের যখন Melody যুগের গান প্রায় শেষ হতে চলেছে ঠিক তখনই বাপ্পি মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতের আধুনিক গানকে অত্যাধুনিক রূপে মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেন। মার্গ সঙ্গীত থেকে বিদেশী সুরের গানকে সিনেমা জগতে ব্যবহার করে তিনি হিন্দি সিনেমা জগতের গানকে একটি নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিলেন। তার সুর সেই সময় অসামান্য সাফল্য লাভ করে। হিন্দি সিনেমায় আমেরিকার Pop Singer মাইকেল জ্যাকসনকে দিয়ে তিনি গান গাওয়ান এবং সেই গান চূড়ান্ত popular হওয়ায় বাপ্পি লাহিড়ীর নাম *Guinness Book of World* এ ঠাঁই পায়। বহু নামী দামী শিল্পী বাপ্পির সুরে গান গেয়েছেন যেমন লতাজী, কিশোরকুমার ইত্যাদি। বাংলা সিনেমা জগতেও বাপ্পীর অবাধ বিচরণ ছিল। অসংখ্য অবিস্মরণীয় বাংলা গান তিনি তৈরি করেছেন তার মধ্যে লতাজীর কণ্ঠে গাওয়া 'মঙ্গল দীপ জ্বেলে' এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। খুব সত্যি কথা এই যে বাপ্পি তার সঙ্গীত জীবনে 'মঙ্গল দীপ জ্বেলে'-ই চলে গেলেন সে দীপ মানুষের স্মৃতিতে, ভাবনাতে চিরদিন অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

এইভাবেই যুগের পর যুগ শিল্পীরা তাঁদের কীর্তিকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করে নিজের দেশকে নিজের জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। আমি এঁদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

# দরদী-মরমী, জনগণবন্দিত সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

**কাঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়**
চক্ষু চিকিৎসক

একটি নাম, নামেই গান— সে গান শুধু ধনঞ্জয়
একটি মান, দেদীপ্যমান— সে মানে মানী ধনঞ্জয়,
একটি প্রাণ, আকাশপ্রাণ— সে প্রাণ জানি ধনঞ্জয়।

যে কালজয়ী শিল্পীকে স্মরণ করে এই লেখা, তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসংগীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৯২২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর—হাওড়ার বালিতে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক আগেই ১৯৩৮ সালে রেডিওতে গান গেয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন ধনঞ্জয়। ১৯৪০ সালে প্রথম বেসিক রেকর্ড 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাব না অভিমান' প্রকাশের সঙ্গেই বাংলার সংগীতরসিকজন বুঝতে পারলেন বাংলার সংগীতাকাশে এক যুগন্ধর, চিরস্থায়ী নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। তখনকার সময়ে তাঁর প্রথম রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল ৭৫ হাজার কপি—সময়ের নিরিখে একটা চিরকালীন রেকর্ড। ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে যথাক্রমে "আলেয়া" ছবিতে 'মাটির এ খেলাঘরে' এবং "শহর থেকে দূরে" ছবিতে 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি নে তোর প্রেমিক শ্যামরায়' তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিল মাত্র ২০-২১ বছর বয়সেই। শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে একের পর এক বেসিক রেকর্ড সুপারহিট হওয়ায় অচিরেই তিনি বাংলার সংগীতজগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, জনপ্রিয় শিল্পীরূপে পরিগণিত হলেন। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালে "স্বামীজী" ছবিতে তাঁর গলায় 'মন চল নিজ নিকেতনে' ও 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' এবং ১৯৫২ সালে "যাত্রিক" ছবিতে তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত 'তু চুঁঢ়তা হ্যায়' ও 'দিলওয়ালে দিলগীর' গানগুলি সংগীতের অন্য আঙ্গিকেও তাঁর দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল। এলো ১৯৫২ সাল—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" চলচ্চিত্রে (সুচিত্রা সেন অভিনীত প্রথম ছায়াছবি) তাঁর একক কণ্ঠে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গানগুলি জনমানসকে বিমোহিত করল। আবার এই ১৯৫২ সালেই "পাশের বাড়ি" ছবিতে 'ঝির ঝির ঝির ঝিরঝিরি বরষায়', 'রূপসায়রের বুকে' প্রভৃতি গানগুলি বাংলার আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলল। ১৯৫৪ সালে উত্তমকুমার অভিনীত "নবজন্ম" ছবিটি মুক্তি পেল—এই ছবিতে উত্তমের গলায় ধনঞ্জয়ের নেপথ্যকণ্ঠ 'আমি আঙুল কাটিয়া কলম বানাই' গানটি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করল। এই ছবিটির পর সংগীত পরিচালকরা এবং স্বয়ং উত্তমকুমার চেয়েছিলেন যে পরবর্তী সময়েও উত্তমের গলায় ধনঞ্জয়বাবুই নেপথ্য কণ্ঠদান করুন, —কিন্তু ধনঞ্জয় রাজী হননি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৯৭৪ সালে কলকাতার কলামন্দিরে স্বনামধন্য কৌতুকাভিনেতা জহর রায় দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে একটি সংগীতাসরের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন দুই দিকপাল— হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রথম পর্বে গান শুনিয়েছিলেন হেমন্তবাবু। দ্বিতীয়পর্বে ধনঞ্জয়বাবুকে মঞ্চে উপস্থিত করে জহর রায় বলেছিলেন—"সংগীতজগতে ধনঞ্জয় কোনো ব্যক্তি নয়, —সে নিজে একটা প্রতিষ্ঠান। তার সহযোগিতায় কত শিল্পী পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে

পেরেছে; কাকে ছেড়ে কার নাম বলব—আরতি, নির্মলা, বনশ্রী, মৃণাল, সনৎ, সুদাম, পিন্টু এবং সর্বোপরি তার ভাই পান্নালাল। সকলের প্রতিষ্ঠার পিছনেই মুখ্য ভূমিকা ধনঞ্জয়ের। আর হেমন্ত আজকের 'হেমন্ত' হয়ে উঠতে পেরেছে সেও ধনঞ্জয়ের জন্যই। "নবজন্ম" ছবিতে উত্তমের গলায় ধনঞ্জয়ের গান শুনে সংগীত পরিচালকরা যখন ধনঞ্জয়কে চাইছেন, তখন ধনঞ্জয় বলেছে উত্তমের গলায় হেমন্তদাকে বেশি ভালো মানাবে—হেমন্তদাকেই গাইতে দিন। সেই থেকে অন্য কোনো জনপ্রিয় নায়কের গলায় ধনঞ্জয় নেপথ্য কণ্ঠদান করেনি। জানিনা সারা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোনো শিল্পী এইরকম স্বার্থত্যাগ করতে পারেন কিনা!"

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে একদিকে যেমন বেসিক রেকর্ডে তাঁর গাওয়া 'বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি', 'শুধু মুখের কথাটি শুনে গেছ তুমি', 'কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি', 'চেয়েছি তোমায় সে কি মোর অপরাধ', 'কুসুম যেমন ওই মধুকরে দিতে মধু', 'শোনো শোনো কথাটি শোনো', 'চামেলী মেলোনা আঁখি', 'রুমাঝুমাঝুম বাদল ঝরে', 'ওগো সুচরিতা', 'এইটুকু এই জীবনটাতে', 'মাটিতে জন্ম নিলাম', 'এই ঝির ঝির ঝির বাতাসে', 'ঝনন ঝনন বাজে', 'অন্তবিহীন এই অন্ধরাতের শেষ' প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় গান তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল, অন্যদিকে তেমন "সাড়ে চুয়াত্তর", "মেজদিদি", "বাবলা", "চন্দ্রনাথ", "কেরী সাহেবের মুন্সী", "অর্ধাঙ্গিনী", "শিল্পী", "সবার উপরে", "ত্রিযামা", "তানসেন", "সাধারণ মেয়ে", "ভ্রান্তিবিলাস", "সাহেব বিবি সেলাম", "ঢুলি" প্রভৃতি ছায়াছবিতে তাঁর নেপথ্য কণ্ঠদান তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয়তম শিল্পীর শিরোপা দিল। বস্তুতঃ ৪০ দশকের মধ্যভাগ থেকে ৬০ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা সংগীতজগতের একমাত্র সুপারস্টার, মুকুটহীন সম্রাট। বাংলা চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলির পাঠক-পাঠিকাদের বিচারে এই সময়ে তিনি একটানা ১২ বছর শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা সংগীতজগতের রসপিপাসু মানুষ আদর করে তাঁকে ডাকলেন—'পাগল করা ধনঞ্জয়'। এই সময় মুম্বাই-এর চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক এবং সংগীত পরিচালকরা তাঁকে বহুবার মুম্বাই যাবার জন্য অনুরোধ জানালেও ধনঞ্জয় সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন বাংলার মাতৃভূমি ও মানুষজনকে ভালবেসে। এমনকি শচীনদেব বর্মণ, নৌশাদ, লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি প্রমুখ মানুষজনও ধনঞ্জয়বাবুকে রাজী করাতে পারেননি।

১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগে ঘটল এক রোমহর্ষক যুগান্তকারী ঘটনা। নিজে নির্দেশ দিয়ে, শিখিয়ে, তৈরি করে আদরের ছোটভাই পান্নালালকে তিনি ভক্তিগীতি ও শ্যামাসংগীতের জগতটা ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেকে আধুনিক গানেই আবদ্ধ রেখে। কিন্তু পরম কৃপাময় ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ২ বার স্বপ্নাদেশে "রাণি রাসমণি" ছায়াছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় তাঁর নেপথ্য কণ্ঠদান তাঁকে ভক্তিগীতির জগতেও এক চিরকালীন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত করল। পরবর্তীকালে "সাধক রামপ্রসাদ" (একটা চলচ্চিত্রে সর্বাধিক ২৩টি গানের রেকর্ড), "সাধক বামাক্ষ্যাপা", "সাধক কমলাকান্ত", "নীলাচলে মহাপ্রভু", "সাধক ত্রৈলঙ্গস্বামী", "মহাতীর্থ কালীঘাট", "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ", "দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা" প্রভৃতি ছবিতে তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত ভক্তিসংগীত বাংলার জনমানসকে ভক্তিরসে প্লাবিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ভাই পান্নালালের কথা চিন্তা করেই গ্রামোফোন কোম্পানীর বহু অনুরোধেও তিনি বেসিক রেকর্ডে ভক্তিগীতি গাইতে রাজী হননি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন ধনঞ্জয়ের গানের ভক্ত। ১৯৫৯ সালে 'উল্টোরথ' পুরস্কার বিতরণী উৎসব 'মেট্রো' সিনেমা হলে। প্রধান অতিথিরূপে পুরস্কার বিতরণ করতে আসছেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; অনুষ্ঠান সভাপতি কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জনতার মধ্য দিয়ে হলে ঢুকতে ঢুকতে বলছেন— "Where is the 'Golden Voice', আমি এখানে শুধু পুরস্কার বিতরণের জন্য আসিনি, এসেছি শ্রীমান ধনঞ্জয়ের

গান শোনার লোভে।" ঐ অনুষ্ঠানেই তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ধনঞ্জয়কে 'স্বর্ণকণ্ঠ' আখ্যায় ভূষিত করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এলো ১৯৬১ সাল—ঘটল আর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। কবিগুরুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বহু প্রাজ্ঞ সংগীতগুণীর অনুরোধে ধনঞ্জয় একটি ৪ খানা রবীন্দ্রসংগীতের ই-পি রেকর্ড করলেন এবং কলকাতা মহানগরীতে সমস্ত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেন। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে তদানীন্তন 'যুগান্তর' এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকার কলা-সমালোচকরা লিখেছিলেন—'ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য যে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত গান না, তা এই জগতের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তিনি গাইলে রবীন্দ্রসংগীত জগৎ এক নতুন মাত্রা ও ঘরানা খুঁজে পেত।' সেই বছরে বিডন স্কোয়ারে (রবীন্দ্র কানন) আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মঞ্চ থেকে নামছেন ধনঞ্জয়—সংগীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দিকে একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ধনু এই Form-এ সই করে দে।" ধনঞ্জয় সই করার কারণ বা উদ্দেশ্য জানতে চাইলে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন—"এটা নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। এবার তুমি 'পদ্মশ্রী' খেতাব পাবে, স্বয়ং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তোমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন—এটা তোমার সম্মতি পত্র।" ধনঞ্জয় উত্তরে বলেছিলেন—"আমি সই করতে পারব না। আমার বয়স এখনও ৪০-এর থেকে ১ বছর কম। আমি নিজেকে 'পদ্মশ্রী' খেতাবের যোগ্য মনে করছি না। আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের আগে এই সম্মান জানানো উচিত। আপনি আমার হয়ে ডাঃ রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন, দেখা হলে আমি নিজে আবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।" ইতিমধ্যে অনেকবার সলিল চৌধুরীর অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেও ১৯৬৩ সালে সলিল চৌধুরীর একান্ত আগ্রহে ধনঞ্জয়-সলিল যুগলবন্দীতে সৃষ্টি হল বাংলা আধুনিক গানে তুমুল জনপ্রিয়, আলোড়ন সৃষ্টিকারী গান—'ঝনন ঝনন বাজে সুরবাহারে রসশৃঙ্গারে' এবং 'অন্তবিহীন এই অন্ধরাতের শেষ'। ১৯৬৬ সালে ছোটোভাই পান্নালালের মৃত্যুর পর ধনঞ্জয়বাবু বিয়োগব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন থেকেই বিশেষ অনুরোধ বা সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত অনুষ্ঠান ছাড়া তিনি অংশগ্রহণে রাজি হতেন না। তবে পরবর্তীকালে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ১৯৭১ সাল থেকে প্রচুর একক আসরে গান শোনাতে শুরু করেন। বলাই বাহুল্য ওই রকম প্রত্যেকটি আসরে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে (রবীন্দ্রসদন বা কলামন্দির অথবা মহাজাতি সদন) শিল্পী একটানা ৩/$^{১}/_{২}$—৪ ঘণ্টা গান গেয়ে শ্রোতাদের প্রত্যাশার পেয়ালাকে পূর্ণ করে ছাড়তেন।

ধনঞ্জয়বাবু যে শুধু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্নেহভাজন ছিলেন তাই নয়, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের অপর দুই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এবং শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ও ছিলেন তাঁর গানের বিশেষ অনুরাগী, —তাঁরা ধনঞ্জয়কে প্রভূত সম্মান করতেন। ১৯৮৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর শিল্পীর সংগীতজীবনের 'সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক বিশাল মর্যাদামণ্ডিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে শিল্পীকে সংবর্ধনা জানিয়ে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন— "ধনঞ্জয়বাবু বাঙালির গর্ব, বাংলা সংগীতের সম্পদ। দীর্ঘ অর্ধশতক তিনি গান শুনিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন, আরও দীর্ঘদিন তিনি আমাদের মধ্যে থেকে গান শুনিয়ে যান।" ১৯৮৯ সাল ভবানীপুরের একটি বিখ্যাত মণ্ডপে দুর্গাপূজার উদ্বোধন ওরতে এলেন শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। সঙ্গে আরেকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁরা মঞ্চে উঠে দেখলেন—এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতে এসে ধনঞ্জয়বাবু সামনের সারিতে বসে আছেন। সিদ্ধার্থবাবু উদ্যোক্তাদের ডেকে বললেন—"ধনঞ্জয়বাবু নীচে বসে থাকবেন আর আমরা মঞ্চের উপরে পূজার উদ্বোধন করব, তা হতে পারে না। তিনি মঞ্চে না উঠে এলে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হবে না।" সিদ্ধার্থবাবুর বিশেষ অনুরোধে শিল্পী মঞ্চে এসে তাঁর পাশে আসন গ্রহণ করার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন

হয়। পূজা উদ্বোধনের পর সেখানে কিছুক্ষণ থেকে ধনঞ্জয়বাবুর কণ্ঠে কয়েকটি গান শুনে সিদ্ধার্থবাবু ও প্রণববাবু মণ্ডপ ত্যাগ করেন।

মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য? এক কথায় বলা যায় তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকারী, প্রচারবিমুখ, দরদী এবং শিশুর মত সরল ও আবেগপ্রবণ এক মানুষ। তিনি নিজে শ্রোতাদের প্রাপ্য সম্মান জানাতেন এবং কাছে টেনে নিতেন। কোনো মানুষ বিপদে পড়লে তিনি নিজে আকুল হয়ে উঠতেন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে আকাশবাণীর আমন্ত্রণে নিজে গান লিখে ও সুর করে রেডিওতে ব্রডকাস্ট করেছিলেন। জানিনা, সেই সব গান আকাশবাণীর সংগ্রহে আছে কিনা! ছোটোভাই পান্নালালের অকাল প্রয়াণে ব্যথাতুর ধনঞ্জয় নিজে দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন—'ত্রিভুবন জয় করিয়া রাবণ আনিল রত্নরাজি' এবং 'থির হয়ে তুই বস দেখি মা'। দুটি গানেই শিল্পীর বুক ফাটা কান্নার রুদ্ধশ্বাস—গান দুটি শ্রোতাদের কাছে প্রভূত সমাদর লাভ করল, অথচ গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী ঐ গান দুটির বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ ও প্রচার করলেন না। আসলে কণ্ঠসংগীত শিল্পীকুলে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন একমাত্র আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধা যিনি নিজের স্বার্থত্যাগ করে অপর শিল্পীদের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে একার সামর্থ্যে রুখে দাঁড়াতেন। তার জন্য তাঁকে প্রচুর ক্ষতি ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। একবার এই রকম এক কারণে নিজের শিল্পী জীবনের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর আকাশবাণীতে সংগীত পরিবেশন থেকে নিজেকে বিরত করে রেখেছিলেন। আবার আরেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ৪ জন অনুজ শিল্পীর সংগীতজীবনকে বাঁচাতে নিজের স্বার্থ বিপন্ন করে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়ার কাছে একাই দরবার করে তাঁদের শিল্পী জীবনকে রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সব সংগ্রামেই ধনঞ্জয় জয়ী হতেন। ধনঞ্জয় ছিলেন যথার্থই 'কিংবদন্তী'—কত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবন ঘিরে। "মীরাবাঈ" ছবির শুটিং চলাকালীন ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের কর্ণধার বাবুলাল চৌখানীর গৃহে রক্ষিত 'গোপাল' মূর্তির বর্ষণসিক্ত রাতেই ধনঞ্জয়ের বাসস্থানে আনয়ন, নৈহাটি কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের ভিটেয় তাঁর উপস্থিতির পর অসময়ে মাতৃমন্দিরের দরজা খোলা—প্রভৃতি ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য, কৃপাধন্য।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য যে কত বড় মাপের সংগীতশিল্পী ছিলেন তা আমার মত একজন অন্য জগতের মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পরম পূজ্যবাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ বলতেন, —"ধনঞ্জয় এক ক্ষণজন্মা, বিরল প্রতিভা; সে ভগবানের কাছ থেকে গান শিখে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। সে যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই জায়গাটাই পবিত্র হয়ে যায়।" সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কাননদেবী তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'সবারে আমি নমি'-তে লিখেছেন, —"বাংলার সংগীতের কথা ভাবলেই যে দুজন শিল্পীর কথা প্রথমেই মনে আসে তাঁরা হলেন—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ধনঞ্জয় আমাদের শুটিং-এর অবসরগুলি তাঁর অফুরান কণ্ঠ-ঐশ্বর্যে ভরিয়ে রাখতেন। জানি তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তবু কেন জানিনা মনে হয় আজ যে আসনে তিনি অধিষ্ঠান করছেন তার চেয়েও অনেক বড়ো আসনের অধিকারী তিনি।" অবিস্মরণীয় সুরস্রষ্টা রবিন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"ধনঞ্জয় 'জাদুকণ্ঠ-জাদুকর'। গানের তালিম দিয়েছি অনেককেই, কিন্তু শেখাতে হয়নি একজনকেই---সে ধনঞ্জয়।" দিকপাল সংগীত পরিচালক অনিল বাগচীর বিশ্লেষণে—"সবাই শিল্পী, কিন্তু ধনঞ্জয় শিল্পীদের শিল্পী। সে ঈশ্বরের কাছে গান শিখে এসেছে।" যুগন্ধর সুরকার সলিল চৌধুরীর বিচারে---"ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত শিল্পী ধনঞ্জয়দা। মহম্মদ রফি বা তালাত মাহমুদের সমগোত্রীয় অথবা কিয়দংশ তাঁদের থেকে উন্নততর প্রতিভার অধিকারী হয়েও ধনুদা নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন, এতে সংগীত জগতের ক্ষতি হয়ে গেল।" স্মৃতিচারণায় হেমন্ত-জায়া শ্রদ্ধেয়া বেলা মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, —"৫০-এর দশকে তিনজন শিল্পীর

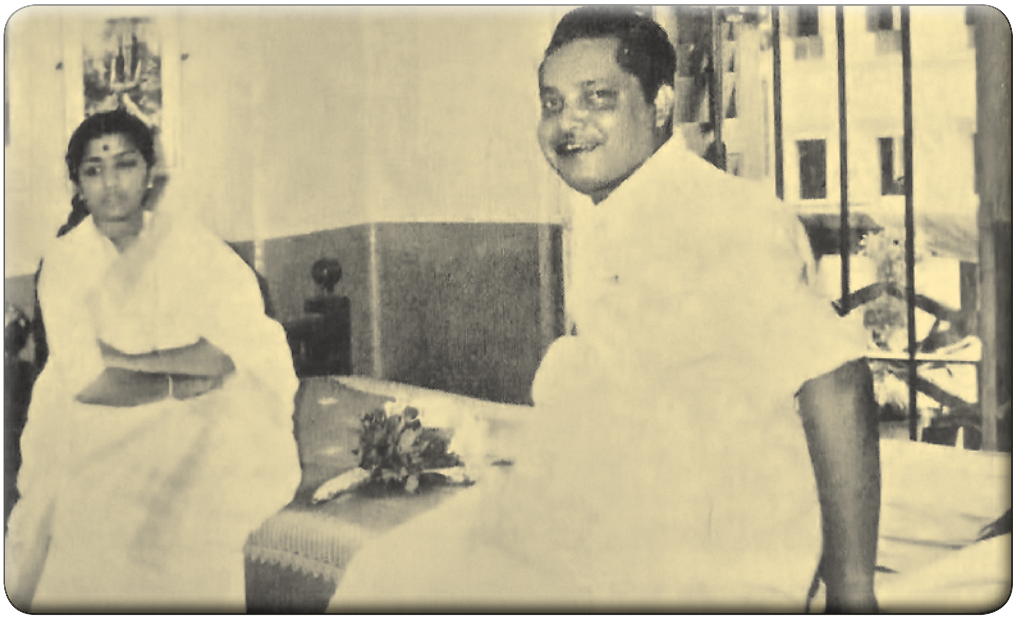

লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তে সপরিবার ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরত—জগন্ময়, ধনঞ্জয়, হেমন্ত। বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা তাঁদের আসরে এই তিন শিল্পীকে পেতে চাইতেন, তবে জনপ্রিয়তার বিচারে ধনঞ্জয় ছিলেন কিছুটা এগিয়ে।" বাংলা গানের স্বর্ণযুগের আরেক প্রথিতযশা শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় বলেছিলেন, —"B.Sc. Chemistry Honours-এ 1st Class পেয়েও M.Sc. না পড়ে গানের জগতে এলাম শুধু ধনঞ্জয়দাকে অনুসরণ করে। কেবলমাত্র গান গেয়ে যে এত যশ, খ্যাতি, শ্রদ্ধা, সম্মান লাভ করা যায় তা উপলব্ধি করেছিলাম তাঁকে দেখেই। আমরা যখন গানের জগতে প্রবেশ করছি, তখন সংগীতাকাশে দুই সূর্য—একজন মধ্যাহ্ন গগনের প্রখর দীপ্তিতে দীপ্তমান—তিনি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য; আরেকজন নবারুণ হয়ে ফুটে উঠছেন—তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মাইক্রোফোনের ব্যবহার শিখেছি বিশেষভাবে ধনঞ্জয়দাকে লক্ষ্য করেই—এত চড়া পর্দায় গান করতেন তাও আবার মুখে পান রেখে, অথচ

কোথাও কোনোরকম শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ থাকত না। অমন পৌরুষদীপ্ত সৌম্য চেহারা, পরনে ধুতি-শার্ট, সরু গোঁফ, ডানহাতে ঘড়ি আর মুখে স্মিতহাসি—আক্ষরিক অর্থেই ধনঞ্জয়দা ছিলেন তখন যুবসমাজের 'হার্টথ্রব'।" স্বনামধন্য তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী তাঁর সাক্ষাৎকার 'তবলার বোল তবলিয়ার বুলি'তে বলেছিলেন—"বাজিয়েছি অনেক বড়ো বড়ো শিল্পীর সঙ্গেই—মান্নাবাবু, সন্ধ্যাদি, মানবভাই, প্রচুর আনন্দও পেয়েছি; কিন্তু 'লয়দার প্রভুর' সঙ্গে বাজিয়ে যে সুখ পেয়েছি তার কোনো তুলনাই হয়না।" প্রসঙ্গতঃ রাধাকান্ত নন্দী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ডাকতেন 'লয়দার প্রভু' বলে আর ধনঞ্জয় রাধাকান্তকে ডাকতেন 'তবলাকান্ত' বলে। "অঙ্গীকার" ছায়াছবিতে ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে বাংলা খেয়াল গান শুনে প্রণম্য উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী বলেছিলেন—"লঘুসংগীতের জগত থেকে সরে এসে ধনঞ্জয় যদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে আত্মপ্রকাশ করত তাহলে শ্রদ্ধেয় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরে সারা ভারতবর্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত আমরা একজন শিল্পী খুঁজে পেতাম। বাংলা সংগীতজগতের গৌরবোজ্জ্বল যুগে দুবার 'ত্রয়ী'র সৃষ্টি হয়েছিল—'সুধীরলাল-জগন্ময়-ধনঞ্জয়' এবং 'জগন্ময়-ধনঞ্জয়-হেমন্ত'। আর ৫০ ও ৬০-এর দশকে 'ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়' ছিলেন বাংলা আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য জুটি। জনশ্রুতি আছে কলকাতায় প্রথম উন্মুক্ত জায়গায় গানের অনুষ্ঠান ('জলসা') হয়েছিল তালতলা ডক্টরস লেনে (লর্ডস পাড়া) ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালে। পরপর ৪ বছর ওই অনুষ্ঠানে একক শিল্পী ছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের অগ্রণী উদ্যোক্তা ছিলেন চিকিৎসা জগতের এক মহান দিকপাল মানুষ—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৯৫১ সালে কালীপূজার কয়েকদিন পরে ক্রীক রো-তে ভানু বোসের গ্যারেজটিতে অস্থায়ী মঞ্চ করে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল একক শিল্পী ধনঞ্জয়বাবুকে নিয়ে। ওই হিমেল রাতে ৮টার সময় শিল্পী গান শুরু করে রাত ২টার সময়ে যখন তিনি গান শেষ করেছিলেন, তখন ঐ গলিতে ছিল কয়েক হাজার শ্রোতার উপচে পড়া ভিড়। ওই সময়ের পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে 'জলসা' সমধিক পরিচিতি ও সমাদর লাভ করে।

সব সৃষ্টিরই শেষ থাকে। সেই হিসাবে দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে কণ্ঠের জাদুতে রসিক শ্রোতাদের আপ্লুত, সম্মোহিত করে এই মহাগায়কের জীবনাবসান ঘটল—১৯৯২ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু অবিনশ্বর হয়ে থাকবে তাঁর যুগান্তকারী সংগীত প্রতিভা এবং বাংলার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সমকালীন, চিরকালীন কিন্তু অননুকরণীয় —তাঁর তুলনা শুধু তিনি নিজেই। যুগন্ধর এই শিল্পীকে বিনম্র প্রণাম জানিয়ে বলি—

'তোমার চরণ-চিহ্ন ধরে  পথ যে আমার কাঁদে,
আমার অবুঝ মন মানে না,  ফেলেছ কোন ফাঁদে।'

লতাজীর আদরের ধনঞ্জয় দাদা সঙ্গে গাওয়া চৈতন্য মহাপ্রভু ছবির এই প্রায় বিস্মৃত গানটি পোস্ট করে জানাই লতাজিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা। লতাজি বার বার তাঁর প্রিয় দাদাকে অনুরোধ করেছিলেন বোম্বে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গান গাইবার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই সবিনয়ে সেই অনুরোধ এড়িয়ে গিয়েছেন তাঁর দাদা।

গানটি শোনার জন্য ছবিটিতে ক্লিক করুন
https://www.youtube.com/watch?v=YoSC5t9YROw

# বর্ণময় ধনঞ্জয়

**স্বপন সোম**
**সঙ্গীত সমালোচক**

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। বাংলা গানের ইতিহাসে একটা যুগ। সুদীর্ঘ চার-পাঁচ দশক ধরে তাঁর অভিজাত কণ্ঠে মরমী ভঙ্গিতে উপহার দিয়ে গেছেন কত না বৈচিত্র্যময় গানের সম্ভার : আধুনিক, চিত্রগীতি, ভক্তিমূলক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান। সংগীতে তাঁর এই সার্বিক অধিকারের নেপথ্যে রয়েছে নিবিড় শ্রমসাধ্য অনুশীলন এবং অবশ্যই সহজাত প্রতিভা।

অনুকূল সাংগীতিক পারিবারিক আবহে মানুষ ধনঞ্জয় সেতার-শিল্পী গোকুল নাগ ও উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী সত্যেন্দ্র ঘোষালের কাছে তালিম নিয়ে নিজেকে তৈরি করেন। বাল্যেই সংগীতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ। ১৯৩৮-এ মাত্র ন বছর বয়সে অডিশন দিয়ে বেতারে গাইবার সুযোগ হয়। গেয়েছিলেন 'জোছনা রাতে কেন ডাকে বাঁশি'। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পাঁচ টাকা। বালির 'বালি রিভার্স থম্পসন' স্কুলে পড়ার সময় একবার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় গান গেয়ে প্রধান অতিথি কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে পেলেন পাঁচ টাকা—এই ঘটনা তাঁকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছিল। ওরিয়েন্টাল মিউজিক ভ্যারাইটিস কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ হল। সেসময়ই এই কোম্পানি নাম বদলে হল পাইওনিয়ার ও ভারত রেকর্ড কোম্পানি। তার পরিচালক সুধীর গুহের খুব ভালো লাগল ধনঞ্জয়ের গান। তাঁরই সহায়তায় ধনঞ্জয় রেকর্ড-জগতে পা রাখলেন। ১৯৪০-এ বেরোল প্রথম রেকর্ড, গাইলেন প্রণব রায়ের কথায় সুবল দাশগুপ্তের সুরে দুটি আধুনিক, 'যদি ভুলে যাও মোরে' ও 'ছিল যে আঁখির আগে' (এইচ ৮৬৭ভি)। তখন পাইওনিয়ার ও ভারত কোম্পানির রেকর্ড বেরোত হিন্দুস্তান লেভেলে। এই 'যদি ভুলে যাও মোরে' আবার কিছু পরে পাইওনিয়ার রেকর্ড থেকেও প্রকাশিত হয় 'ঘুমায়ে পড়েছে চাঁদ'-এর সঙ্গে (এন কিউ ২৫৬)। 'যদি ভুলে যাও মোরে' কথা, সুর ও গাওয়ার গুণে আদর পেল। তারপর ১৯৪৩-এ যখন ধনঞ্জয় 'আলেয়া' ছবিতে সুবল দাশগুপ্তের সুরে 'মাটির এ খেলাঘরে' (কথা ঃ প্রণব রায়) আর 'শহর থেকে দূরে'-তে 'রাধে ভুল করে তুই' (কথা : শৈলেন রায়) গাইলেন তাঁর নাম নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল। কথাকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শহর থেকে দূরে' লোকে বারবার দেখতে গেল ধনঞ্জয়ের ওই গানের জন্যেই। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয় নি এই প্রতিভাবান শিল্পীকে। বেসিক আধুনিক আর

সিনেমার গান—এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি এগিয়ে চললেন দুর্বার গতিতে।

রেকর্ডের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সুধীর গুহ তো বটেই, সেই সঙ্গে হিন্দুস্থান কোম্পানির যামিনী মতিলালেরও আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন ধনঞ্জয়। তাছাড়া সেই প্রথম পর্বেই রেকর্ড করার সূত্রে বিশিষ্ট সুরকার—সুবল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত ও শৈলেশ দত্তগুপ্তের সান্নিধ্যে পেলেন স্বরক্ষেপণ, উচ্চারণ বা গলার মডিউলেশন সংক্রান্ত শিক্ষা যা তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। বেসিক গানের প্রধান ধারা অনুযায়ী ধনঞ্জয় মূলত গেয়েছেন প্রেমেরই গান। অন্য বিষয়ের গানও কিছু ছিল। সুরে অবশ্যই মেলোডির প্রাধান্য। মেলোডি-যুক্ত গভীর সুরের ভালোবাসার গানের মধ্যে নিশ্চয় মনে পড়বে প্রণব রায়ের লেখায় শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে 'শুধু মুখের কথাটি শুনে গেছ তুমি', কমল দাশগুপ্তের সুরে 'মোর জীবনের দুটি রাতি', দাদা প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরে 'বাসরের দীপ আর', অনিল ভট্টাচার্যের কথায় নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে 'তোমার চরণচিহ্ন ধরে' বা 'আমায় তুমি ভুলতে পারো', অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'কাল সারারাত চোখে' (কথা : সুনীলবরণ)। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তখন প্রতিশ্রুতিমান তরুণ, গান গাইছেন, সুর করছেন। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য যদি তাঁর সুরে গান করেন, এই বাসনা নিয়ে সতীনাথ একদিন বন্ধু-গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে এলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ি। সম্ভাবনাময় নবীনদের ব্যাপারে ধনঞ্জয় সবসময় উৎসাহী। সতীনাথের সুর শুনে রাজি হলেন এবং মনে রাখার মতো কয়েকটি গান রেকর্ড করলেন—'শূন্য ঘরে ফিরে এলাম যেই' ও 'কতদিন দেখা হয়নি দুজনে' (কথা : শ্যামল গুপ্ত) এবং 'আমি চেয়েছি তোমায়' ও 'বিদায় নিতে কি এলে' (কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। শ্যামল মিত্রও তখন দ্রুত উঠে আসছেন শিল্পী-সুরকার হিসেবে, তাঁর মিষ্টি সুরে ধনঞ্জয় গাইলেন 'দোলে শালপিয়ালের বন' (কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। নিখিল চট্টোপাধ্যায় হয়ত ততটা নামী সুরকার নন, তাও ধনঞ্জয় তাঁর মরমী সুরে স্মৃতিধার্য করলেন 'এতটুকু আমি কতটুকু পারি দিতে এই পৃথিবীতে'। শিল্পীমনের বেদনা-অভিমান থেকে উৎসারিত 'শিল্পীমনের বেদনা নিঙ্গারি' (কথা ও সুর : জহর মুখোপাধ্যায়) বা 'হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে' (কথা : শ্যামল গুপ্ত, সুর ঃ প্রফুল্ল ভট্টাচার্য) অবশ্যই প্রেমের গান নয়। ধনঞ্জয়ের হৃদয়স্পর্শী নিবেদনে গান দুটি স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়ে যায়। একইভাবে অন্য স্বাদ এনে দেয় ধনঞ্জয়ের নিজের কথায়-সুরে 'কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি'। এখানে উল্লেখ্য, ধনঞ্জয় অল্প স্বল্প গানও লিখেছিলেন। প্রবীর মজুমদারের কথায়-সুরে 'মাটিতে জন্ম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে'-র যোগ দেশের মাটির সঙ্গে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধনঞ্জয় তাকে প্রাণবান করেন। এই নিষেধ-ঘেরা জীবন নিয়ে স্বতন্ত্র মেজাজের গান লিখেছিলেন সুবীর হাজরা—'এইটুকু এই জীবনটাতে হাসতে মানা, চলতে মানা/ কথাটিও বলতে মানা / এই মানায় ভরা জীবনটা / কেমন করে কাটাব তা নেই জানা...'। কথার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই সুধীন দাশগুপ্তের সুর, সেইভাবেই রূপায়িত করেন ধনঞ্জয়। মেলোডির সঙ্গে ছন্দের মজা আছে নচিকেতা ঘোষের সুরে 'যদি চাঁদ ডুবে যায় তো যাক' গানে।

রাগভঙ্গিম আধুনিক গান অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন বিশেষভাবে তালিমপ্রাপ্ত ধনঞ্জয়। বেশ কিছু গানে তার পরিচয় মেলে। নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে রাগাশ্রিত 'রুমা ঝুমা ঝুম বাদল ঝরে' রেকর্ড করার সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইম্প্রভাইস করেন, কিন্তু তা গানকে আঘাত করে না। রাগনির্ভর গান যখনই গেয়েছেন এই ভারসাম্য অটুট থেকেছে। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'এমন মধুর ধ্বনি', পবিত্র মিত্রের কথায় নিজের সুরে 'চলে শ্রীমতী শ্যাম অভিসারে', প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরে 'মেঘমেদুর ওই দূর নভে' শুনলে বোঝা যায় গানের সার্বিক রসটাই আসল, নিজের গলার কায়দা দেখানো নয়। অলংকরণ প্রকট বা অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায় না। সুরকার রতু মুখোপাধ্যায় তখন সংগীত-জগতে নবাগত, নিয়মিত ধনঞ্জয়ের বাড়ি কলেজ স্ট্রিটের সিসিল হোটেলে আসেন। সেখানে ধনঞ্জয়কে ঘিরে নানাজনে মিলে চমৎকার আড্ডা বসে। রতুর খুব ইচ্ছে ধনঞ্জয়বাবু তাঁর সুরে যদি একটা গান করেন তাহলে বিশেষ উপকার হয়। বলতে ধনঞ্জয়

রাজি হলেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'চামেলি মেলো না আঁখি' ভালো লাগল, রতুকে বললেন কেদারার ওপর সুর করতে। রতু হারমোনিয়াম বাজাতে না-জানলেও সুন্দর সুর করলেন, ধনঞ্জয় গাইলেনও দারুণ। সলিল চৌধুরী ধনঞ্জয়ের চর্চিত কণ্ঠের কথা ভেবেই কলাবতী রাগে একটা চমৎকার গান তৈরি করলেন, 'ঝনন ঝনন বাজে', কিন্তু অন্তরা-য় নিজের ধরণেই ছন্দটাকে ভাঙেন। তারই উল্টোপিঠে একেবারে উল্টো মেজাজের গান, 'অন্তবিহীন এই অন্ধরাতের শেষ'—পাশ্চাত্য ধরণে। এই আঙ্গিকেও ধনঞ্জয় তাঁর কুশলতা প্রমাণ করেন। বিদেশি সুর-ছন্দের আরও যেসব গান ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে সার্থকতা পায় সেগুলি হল, সুধীন দাশগুপ্তের কথায়-সুরে 'এই ঝির ঝির ঝির বাতাসে', 'ওগো সুচরিতা' বা অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'বলেছিল কি যেন নাম তার' (কথা : প্রবোধ ঘোষ)। প্রত্যেক সুরকার ধনঞ্জয়ের কণ্ঠের স্বরগ্রাম-বিস্তৃতি, বিভিন্ন সপ্তকের মধ্যে ভারসাম্য চমকপ্রদ ভাবে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ধনঞ্জয়ের ত্রিসপ্তকব্যাপী কণ্ঠের কথা মনে রেখেই স্বরবিন্যাস করেন। একটা সময় গ্রামোফোন কোম্পানি হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় গানগুলির বাংলা ভার্সন-গান বিভিন্ন শিল্পীকে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছিল। ধনঞ্জয় গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকরের 'গোরে গোরে ও বাঁকে ছোড়ে'-র ভার্সন-গান 'শোনো শোনো কথাটি শোনো'—যার সুর-ছন্দের ভিত্তি পাশ্চাত্য সংগীতই।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে ভক্তিসংগীতে। তাঁর গাওয়া প্রথম বেসিক ভক্তিগীতিটি কিন্তু ছিল হিন্দিতে, তবে ভাই পান্নালাল ভট্টাচার্য যতদিন বেঁচে ছিলেন, ধনঞ্জয় বেসিক রেকর্ডে বাংলা ভক্তিসংগীত গান নি। অধ্যাত্মসংগীতের স্মরণীয় রূপকার পান্নালালের অকাল-মৃত্যুর পরে সাতের দশকে শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী---এসব রেকর্ড করেছিলেন। তবে সিনেমায় ভক্তিগীতি অনেকদিনই গাইছেন, তাঁর চিত্রগীতির বেশিরভাগই ভক্তিসংগীত। প্রথম গাইলেন রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'স্বামীজী' (১৯৪১) ছবিতে, 'যাবে কি হে দিন আমার' ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশির 'মন চল নিজ নিকেতনে'। শেষোক্ত গানটি ব্রাহ্মসমাজে যেভাবে গাওয়া হয় সেভাবে নয়, রাইচাঁদ এর অন্য সুর করেছিলেন। হৃদয় ছুঁয়ে যায় অনিল বাগচীর সুরে 'রানী রাসমণি' (১৯৫৫)-র 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি' ও 'কোন হিসেবে হর হৃদে'। ভক্তিগীতির সমৃদ্ধি সহজেই উপলব্ধি করা যায় ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে অনিল বাগচীর সুরে 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' (১৯৫৬), 'সাধক কমলাকান্ত' (১৯৬১), প্রবীর মজুমদারের সুরে 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (১৯৫৫) বা শিল্পীর নিজের সুরে 'জয় মা তারা' (১৯৭৮)-র গানগুলিতে। ক্ল্যারিওনেট-শিল্পী রাজেন সরকার একাধিক ছবিতে মনের রাখার মতো সুর করেছেন। তারই একটি, 'ঢুলি' (১৯৫৪)। এ-ছবিতে যুথিকা রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের পাশে সঠিক জায়গা করে নেয় ধনঞ্জয়ের দরদী কণ্ঠের 'ত্রিনয়নী দুর্গা' ও 'ভাঙ্গনের তীরে ঘর বেঁধে'। কোনও কোনও গানে জীবনদর্শন প্রতিফলিত, যেমন, কালীপদ সেনের সুরে সজনীকান্ত দাসের লেখা 'জনম মরণ পা ফেলা' (মেজদিদি, ১৯৫০) এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে শৈলেন রায়ের কথায় 'জীবনপারাবারের মাঝি' (বাবলা, ১৯৫১)। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর একেবারেই সহজ পথে হাঁটে নি 'সাধারণ মেয়ে' (১৯৪৮)-তে 'দাঁড়াও না দোস্ত' (কথা : প্রেমেন্দ্র মিত্র) বা 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৫৬) ছবিতে 'কে তীরন্দাজ' গানে, ধনঞ্জয় সেই দুরূহতা বুঝতেই দেন নি। প্রত্যাশিতভাবেই রবীন চট্টোপাধ্যায় 'তানসেন' (১৯৫৮)-এ জটিল চলনের একটি ধামার গাইয়ে নেন ধনঞ্জয়কে দিয়ে। একইভাবে স্মরণযোগ্য পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে 'ও দিলওয়ালে' ও 'তু ঢুঁঢ়তা হ্যায়' (মহাপ্রস্থানের পথে, ১৯৫২), নচিকেতা ঘোষের সুরে 'আমি আঙ্গুল কাটিয়া' (নবজন্ম, ১৯৫৬) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'ও তুই ঘুমের ঘোরে' (বাদশা, ১৯৬৩)। খুবই সমাদর পেয়েছিল সলিল চৌধুরীর পাশ্চাত্য সুর-আঙ্গিকে 'পাশের বাড়ি' (১৯৫২)-র 'ঝির ঝির ঝির ঝির ঝিরি বরষায়' (কথা : বিমলচন্দ্র ঘোষ)। পাশে সাত মাত্রার 'নয়নে তার ভোমরা কাজল কালো' আবার একেবারেই অন্য গোত্রের। দুটি গানের রূপায়ণেই ধনঞ্জয় সার্থক।

এখানেই বলা দরকার, 'পাশের বাড়ি' ছবিতে ধনঞ্জয় অভিনয়ও করেছিলেন। অভিনয় করেছিলেন আরও তিনটি ছবিতে—'শ্বশুরবাড়ি' (১৯৫৩), 'নববিধান' (১৯৫৪), 'লেডিস সিট' (১৯৫৪)।

একাধিকবার আমন্ত্রণ পেলেও মুম্বাই সংগীত-জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চান নি। একবার অবিশ্যি রাইচাঁদ বড়ালের কথা অমান্য করতে না-পেরে মুম্বাই যান 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' (১৯৫৪)-র গান রেকর্ড করতে ও ওই ছবিতেই লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গান রেকর্ডকরাতে। তবে হিন্দি ছবিতে আর গান নি তা নয়। খান তিন-চার ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন—'ঝুটি কসমে', 'কস্তুরী', 'বিদ্যাপতি'।

রবীন্দ্রগানের একনিষ্ঠ ভক্ত ধনঞ্জয় রেকর্ডে মাত্রই চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন—'গানের ঝরনাতলায়', 'এবার নীরব করে', 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' ও 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন'। তাঁর এই গানগুলি শুনলে নিশ্চিত মনে হবে তিনি আর রবীন্দ্রসঙ্গীত না-গেয়ে শ্রোতাদের বঞ্চিত করেছেন। নানা ধরণের গানেই যে তাঁর পারদর্শিতা ছিল তার প্রমাণ আরও আছে ঃ ব্রহ্মসংগীত—অমৃতলাল গুপ্তের 'দিবা অবসান হল', কাজী নজরুলের 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়', 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', দ্বিজেন্দ্রগীতি 'তোমারেই ভালোবেসেছি', অমর পালের পরিচালনায় লোকসংগীত—'অচেনা এক পাখি' ও 'গুরু কই রইলা'।

কয়েক দশক জুড়ে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য নিবেদিত গানের সম্ভার দেখে সঙ্গীত-রসিক মানুষের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে কোন স্তরের শিল্পী তিনি ছিলেন। ভার্সেটাইল শিল্পী একেই বলে। অথচ যথাযোগ্য পুরস্কার পাননি—যা আমাদের দৈন্যকেই আরও প্রকট করে। তাই বোধহয় বলেছিলেন এক গানে, 'হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে... শিল্পী আমি, আমায় তবু গাইতে হবে গান'। গান তো তিনি অবিরল ধারায় দিয়েই গেছেন। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষ যখন উপস্থিত, তাঁর সংগীত-কৃতির কাছে গিয়ে দাঁড়াই। যথার্থ সম্মান জানাই এই কিংবদন্তি শিল্পীকে।

# আমার গানজীবন

**আরতি বসাক**
**প্রাক্তন বেতারশিল্পী**

কে একজন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কানের কাছে বলল 'নমস্কার করো, উনি তোমার বাবা'। প্রণাম করলাম। শুয়ে থাকা 'বাবা'-কে সবাই কাঁধে নিয়ে চলে গেল। এই আমার বাবার স্মৃতি। মা-কে অবশ্য 'নমস্কার' করা হয়ে ওঠে নি, কারণ তখনও বোধ হয় প্রণাম ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে ওঠে নি। পরে অনেক চেষ্টা করেও মায়ের মুখটা ছবির সাথে মেলাতে পারিনি। এখন অবশ্য সব স্মৃতিই ঝাপসা। ভাসা ভাসা অগোছালো যেটুকু মনে পড়ে বলি।

এখন আমি ঃ প্রদৌহিত্রী অদ্রিজার ফোটোগ্রাফি বিলাসের সৌজন্যে
(ছবিটি কিন্তু পুরস্কৃত)

মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে মন্দিরময় পাথড়া (এখন জানি 'মন্দিরময়', তখন জানতুম না) গ্রামের ভিটে ছেড়ে মামা প্রফুল্ল চন্দ্র সিংহের হাত ধরে মেদিনীপুর শহরে এলাম। তারপর এক জ্ঞাতির সাথে কলকাতাবাসী কাকা শ্রীশ ছন্দ্র দত্ত'র বাড়িতে যখন এলাম তখন বয়েস দশ কি এগারো হবে। সালটা ১৯৪০। অন্যদিকে কাকিমা'র ভাই প্রভাত দত্ত ('মামা' বলে ডাকতাম তাঁকে) তখন প্রখ্যাত 'বোসেক এণ্ড বোসেক' কোম্পানীর কর্মী। কর্ণধার সুবালা বসাক (যিনি আর পাঁচ বছর পর আমার শাশুড়ি হবেন) মামা'কে বলেছিলেন একটি 'অনাথা মেয়ে' দিতে, তিনি 'নিজের মেয়ের' মতো করে বড়ো করতে চান। কাকার বাড়ি থেকে মামার হাত ধরে তাঁদের ৩ নম্বর প্রিন্সেপ স্ট্রীটের বাড়িতে এলাম। কাকা নিস্তার পেলেন, সুবালা 'নিজের মেয়ে'। সে এক অভূতপূর্ব নতুন জগৎ। ব্রাহ্ম পরিবারের সমাজাচার আর দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'মা'-এর শাসনে নতুন করে শিক্ষা আরম্ভ হলো। আর শিক্ষার প্রথম পাঠই হোলো গান শেখা। এদের দেখতুম 'গান নাই আর জান নাই' একই কথা। জন্মদিন-গান, বিয়ের অনুষ্ঠান-গান, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-গান, আর উপাসনা তো আছেই। ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্পর্শে না এলে আরো অনেক কিছুর মতো গানও হোতো না আমার।

১৯৪৫-এ বিয়ের ক-বছর আগে থেকেই মা-এর নির্দেশে গানে হাতেখড়ি। প্রথম শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সুধীর বোস (আমরা অবশ্য 'পটলবাবু' বলেই চিনতুম বেশী)। ব্রহ্মসঙ্গীতই শেখাতেন তিনি মূলত। আসলে এদের গানময় পরিবারে গান না গেয়ে থাকার উপায়ই ছিল না। অবশ্য পড়াশুনাও (বিশেষত ইংরেজী শিক্ষা) চলত পাশাপাশি।

আমায় 'গীতবিতান'-এ ভর্তি করা হোলো। সেখানে প্রথাগত সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হোলো সুজিত সেনের কাছে। রবীন্দ্রনাথের গান মূলত। তাঁর দেহাবসানের পর সান্নিধ্যে এলাম কনক'দির (তখন

তিনি কনক দাস, পরে দেবব্রত বিশ্বাসের ভাইকে বিবাহ করে কনক বিশ্বাস হলেন) এবং নিহারবিন্দু সেনের। তাঁদের কাছে নতুন করে রবি ঠাকুরের গানকে একেবারে অন্য রূপে চিনলাম। মনে আছে, সে সময় রুমা গুহঠাকুরতা আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্বে থাকতেন, যদিও তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। বেশ সখ্যতা হয়েছিল।

তখন গীতবিতানে ভর্তি হয়ে গেছি
(প্রিন্সেপ স্ট্রীটের বাড়ির ছাদে, ১৯৪৪ হবে হয়ত)

১৯৫০ থেকে '৫৭-র মধ্যে আমার তিন কন্যার জন্ম। কাজেই, গান শেখায় ছেদ। গান গাওয়ায় ছেদ নয় কিন্তু। অনুষ্ঠান মানেই গান, আর স্বামীর আমোঘ নির্দেশ ঃ 'আরতি, গান গাও'। দশ বছর পরে '৬০ সাল নাগাদ নতুন করে গান ধরা স্বামীর বন্ধু হরেন চৌধুরীর (আমরা তাঁকে দীপক'দা বলে ডাকতুম) আগ্রহে। এদের 'রূপক অ্যামেচার ক্লাব' নামে একটি সংগঠন গজিয়েছিল। তারা মহাজাতি সদনে (সম্ভবত) ১৯৬২-তে 'বসন্তোৎসব' আর 'তাসের দেশ' করলে। এবং, যথারীতি, 'আরতি গান গাও'। এখানে গান শুনে সবাই খুব সুখ্যাতি করলে। আমারও মনোবল বাড়লো। আর ছিল স্বামীর অসীম আগ্রহ। এর মাঝেই তার সাথে পরিচয় হোলো রাইচাঁদ বড়ালের। তিনি গান শুনে বললেন, এর তো যথাযথ 'তালিম' হওয়া উচিত। আমার জীবনের আরো এক নতুন অধ্যায় শুরু হোলো।

রাইবাবুর সাহায্য ও উৎসাহে বাড়িতে গান শেখা শুরু হোলো। তিনিই গোপাল দাশগুপ্তকে বাড়িতে এসে শেখাতে রাজি করিয়েছিলেন। রবি ঠাকুরের গানের পাশাপাশি অতুলপ্রসাদের গানেও আগ্রহ জন্মালো গোপালবাবুর অনুপ্রেরণা ও শিক্ষায়। আবিষ্ট করা গায়কী ছিল তাঁর। এরপর পরিচয় কবি মজুমদারের সাথে, অবশ্যই স্বামী অরুন বসাকের বন্ধুত্বের সুবাদে। তাঁর কাছেও কিছুদিন শেখা চললো। ইতিমধ্যে জগদ্বিখ্যাত তবলিয়া আল্লারাখ্খা-র সাথে সাক্ষাতের সৌজন্যে সঙ্গীত জগতের বেশ কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্যও হয়েছিল। গোপালবাবুর তালিম আর রাইবাবুর ক্রমাগত উৎসাহের বলে অবশেষে ১৯৬৪ সাল নাগাদ রেডিওয় অডিশনের জন্য গেলাম। তাঁদের সকলের আশীর্বাদে অতুলপ্রসাদের গানে নির্বাচিত হলাম। রেডিওয় গান গাওয়া শুরু হোলো। ইতিমধ্যে কিছু সময় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে গান শেখারও সৌভাগ্য হয়েছিল। পরের দিন তাঁর সাথে স্টেজে গাওয়ার বিরল অভিজ্ঞতাও হয়েছে বার কতক। আমার মতো হারিয়ে যাওয়া একটা মেয়েও যে জীবনের এত অর্থ খুঁজে পেতে পারে, তা এখনও আয়নার সামনে দাঁড়ালে বিশ্বাসই হয় না। যাই হোক, পরের পনেরো বছর (সম্ভবত ১৯৮০ সাল অবধি) একটানা গেয়েছি, মূলত অতুলপ্রসাদের গান। মনের আনন্দেই গেয়েছি। প্রত্যাশা ছিল না তো।

বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর, ১৯৬৯ ৯২৯ বেতার জগৎ : ৪০ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা

কলিকাতা
ক
শিলিগুড়ি ও আগরতলা

প্রথম অধিবেশন
৬-০০ বন্দেমাতরম্
জাতীয় সংহতির সংকল্প
৬-১০ সুভাষিত
মহাত্মা গান্ধীর লেখা থেকে পাঠ
৬-১৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-৩০ অতুলপ্রসাদ রায়—বাঁশি ‡
(শিলিগুড়ি : বন্দেমাতরম্, সংগীত +)
৬-৪৫ দেশবন্দনা
৬-৫৫ প্রার্থনা
গান্ধীজীর প্রার্থনান্তে ভাষণের অংশবিশেষ থেকে পাঠ
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
(বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ রাধা দৈবলা—ভজন ‡
৭-৪৫ নীলিমা সেন—রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ মঞ্জু দাস—লোকগীতি
(শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ)
৮-১৫ সমরেশ রায়—আধুনিক
(শিলিগুড়ি : ইংরেজী সংবাদ)
৮-৩০ নিমাইচাঁদ বড়াল—ধ্রুপদ
(শিলিগুড়ি : সমাপ্তি)
৯-০০ বাংলা সংবাদ
৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত +
৯-১৫ আধুনিক +
৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা
৯-৪৫ বিভা সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগে
১০-৩০ গিরিজা দেবী—খেয়াল

আরতি বসাক : আজ অপরাহ্ণে কলিকাতা থেকে অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনাবেন

তৃতীয় অধিবেশন
৫-০০ পশুপতি দাস—সেতার
৫-৩০ রতিকান্ত রায়চৌধুরী
শ্যামাসংগীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা : ৫-৩০ মিঃ—৬টা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান; ৬টায় ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ)
৫-৪৫ বাসবশ্রী চক্রবর্তী
গীত ও ভজন
৬-০০ অতুলপ্রসাদ রায়—বাঁশি
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
(বাংলা)
৬-১০ জয়তু মহাত্মাজী
আজকের কথা : কথিকা; পরিচ্ছন্নতা ও গান্ধীজী : জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে হিন্দী কথিকা; ভজন

বাংলায় সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমা—কমলাকান্তপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(শর্টওয়েভে)
৮-১০ আরতি বসাক
অতুলপ্রসাদের গান
(শর্টওয়েভে)
(শিলিগুড়ি : কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; আগরতলা ও শিলিগুড়ি : ৮-১০ মিঃ দিল্লী ক-এর অনুরূপ; ৮-২৫ মিঃ—৮-৪৫ মিঃ পর্যন্ত কলিকাতা ক-এর অনুরূপ)
৮-৩০ মঞ্জু দাস—লোকগীতি
৮-৪৫ শান্তি-সাধক লাল বাহাদুর
লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ৬৬তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা কথিকা;
সমরেশ রায়—রবীন্দ্রসংগীত
(শর্টওয়েভে)
(আগরতলা ও শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ)
৯-০০ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সরোদ
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা : ইংরেজী সংবাদ; শিলিগুড়ি : ৯-১০ মিঃ—৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত দিল্লী ক-এর অনুরূপ; আগরতলা : ৯-১০ মিঃ সংগীত +)
৯-৩০ স্বরাজ ও গান্ধী ভাবনা
মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বারোয়ারী সম্মেলন
(রম্যগীতি; শর্টওয়েভে)
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
(শিলিগুড়ি : সমাপ্তি)
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ নীলিমা সেন—রবীন্দ্রসংগীত
১০-৩০ জয় মৃত্যুঞ্জয় :
মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির সংগীত

৭-৪৫ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৫০ ডি. ভি. পালুসকর—ভজন
৮-০০ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ
৮-৩০ মায়া রায়—রাগপ্রধান
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ ‡
৯-১৫ উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান
অবকাশরঞ্জন
(দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার)
৯-৩০ দি কাস্টিং রোজেস :
গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থান থেকে প্রেরিত সংবাদ অবলম্বনে ইংরেজী অনুষ্ঠান
(দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার)
১০-৩৫ নিমাইচাঁদ বড়াল—এস্রাজ
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি
নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে কলিকাতা খ-এর অন্যান্য অনুষ্ঠান কলিকাতা ক-এর অনুরূপ

কলিকাতা গ
বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান
সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—৩টা; রাত ৬-৩০ মিঃ—১১-১০ মিঃ

দিল্লী
ক
৬-০৫ সকাল ঃ আজ কা বিচার
বন্দনা
৭-০০ ব্রজ মাধুরী
১১-০০ এ. নারায়ণ মল্লিক—খেয়াল
১১-৩০ হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া—বাঁশি
১২-০০ দুপুর ঃ নিসার হুসেন খান +
১-০২ মহম্মদ রফি +
৯-০০ রাত ঃ আকবর আহমেদ—সেতার
১০-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-২০ এস. এন. ব্যানার্জী—খেয়াল
খ
৭-৫৫ সকাল ঃ অনন্তকুমার ঘোষ
ভজন ও গীত

বেতার জগৎ (অক্টোবর ১-১৫, ১৯৬৯, পৃ. ৯২৯)।

আধুনিক গান আমার গাওয়া হয়ে ওঠে নি। বাসনাও জাগে নি মনে হয় কখনও। তবে সে সময় রেডিওয় হেমন্তবাবুরা ‘গান শেখার আসর’ বসাতেন। শুনে শুনে ওনারই এক খানা গান তুলেছিলাম। কি গান তা আর মনে নেই। তবে সব গান শুনতাম। এখনো শুনি। সেখানে বাছাবাছির কোনো বালাই নেই।

এখন বসে বসে দিন গুনি আর ভাবি ‘নাহি জানে কেহ নাহি জানে/তবু সুর বাজে মোর গানে’। বললে বিশ্বাস করবেন না, এখনো কিন্তু গান গাই। শুধু নির্দেশক বদলেছে। নাতি-পুতি-রা যখনই বলে ‘দিদা গান গাও’, ‘বম্মা, গান গাও’। আমি গাই, আজও।

# আধুনিক বাংলা গানে সমাজচেতনা ঃ কিছু কথা

অভীক চট্টোপাধ্যায়

প্রাবন্ধিক

সময় বড়ো বলবান। সমাজ-রাজনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে সৃষ্টিশীল জগৎ, তা সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে বরাবর। ১৯৩০/৪০ দশকে বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে যে রকমারি ঘটনার ঘনঘটা, তার প্রভাব তাই স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছিল শিল্প-সংস্কৃতিতে। যার মধ্যে আছে বাংলা গানও। একটি অঞ্চলের প্রকৃতি সামগ্রিক ভাবে সেই জায়গার জাতিবৈশিষ্ট্যের যে মনোগঠনের ধরন তৈরি করে, তা সৃষ্টির প্রাথমিক বনিয়াদের মধ্যে প্রতিভাত হয়। এই সবমিলিয়ে যেকোনও কিছু গড়ে ওঠা এগিয়ে চলে। বাংলার শস্যশ্যামলা রসসিক্ত প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয় নরম রোমান্টিক মনের প্রকাশ। তাই আমরা দেখি, বাংলা গান বরাবর আপন খেয়ালের পথে এগিয়েছে। তাই বোধহয় শাস্ত্রীয় ধাঁচে গড়ে ওঠা বাংলা গানে নিখাদ 'দরবারি' মেজাজ হুবহু বজায় থাকতে চায়নি সেভাবে কোনওদিন। সুরের কালোয়াতিকে ছাড়িয়ে প্রাধান্য পেয়েছে ভাব। এই পথেই রবীন্দ্রনাথের গান আবির্ভূত হল এক অপরূপ রূপে। যেখানে বাণীর মূল্য যেমন অপরিসীম, তার সঙ্গে উপযুক্ত সুরের আচ্ছাদন। যার আদর্শ প্রকাশ ভাবনির্ভর পরিবেশনে। এর পর, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দিলীপকুমার রায়ের মতো সংগীতমনীষীদের সৃষ্টির আয়োজনে এগিয়ে চললো বাণী-সুরের আদর্শ মিলনে তৈরি ভাবধর্মী বাংলা গানের ধারা। এই ধারারই অনুসারী হিসেবে এলো 'আধুনিক বাংলা গান'। যেখানে সহজ কথায়, নরম মেলডিনির্ভর সুরে ও মনকাড়া গায়কীতে পরিবেশিত হল গান।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গ্রামাফোন রেকর্ড, ১৯২৭ সালে রেডিয়ো ও ১৯৩১ সালে সবাক চলচ্চিত্রের আগমনের ফলে নতুন নতুন বাংলা গানের চাহিদা একলাফে বেড়ে গেল অনেকখানি। তার সঙ্গে এই প্রথম গান তৈরির সঙ্গে বানিজ্যের সরাসরি সম্পর্ক জড়িয়ে গেল। এতদিন গান গড়ে উঠেছে সৃষ্টিকর্তার আপন খেয়ালের জগৎ থেকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল জনপ্রিয়তার দিকটাকে মাথায় রাখার বিষয়টা। কারণ, গানকে বানিজ্যিকভাবে সফল করতে হবে। চাহিদা মেটাতে গান-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে গেল তিনটি শ্রেণীর গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-গায়িকা। ঘটলো একঝাঁক প্রতিভাবানের সমাবেশ।

যেসব শিল্পীরা এলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই শাস্ত্রীয় গানে গভীর তালিম ছিল। তাই শুরুর দিকে আমরা দেখি, তাঁদের অধিকাংশের বাংলা গানেই কালোয়াতির অতিরিক্ত প্রয়োগ। যেখানে ভাবের দিকটা কিছুটা হলেও যেন ব্যাহত। এমনকি বেশিরভাগ শিল্পী রবীন্দ্রনাথের গানও গাইতেন প্রধানত সুরের কারিকুরিকে প্রাধান্য দিয়ে। ১৯৩০ দশকে কিছু নবীন সংগীতকার ভাবলেন একটু অন্যরকম। অতিরিক্ত কালোয়াতিকে বর্জন করে তাঁদের ভাবনা থেকে জন্ম নিলো সহজ কথা ও মিষ্টি সুরনির্ভর বাংলা গান। সেইসময় উঠে আসা নতুন কণ্ঠশিল্পীরা এইসব গান গাইতে লাগলেন নরম মেলডিতে ভরা গায়কীকে আশ্রয় করে। এই ধরনের গানকেই বলা হল, 'কাব্যগীতি'। যা কিছুদিনের

মধ্যেই পরিচিত হল 'আধুনিক বাংলা গান' নামে। আটপৌরে কাহিনিনির্ভর বাংলা ছবিতেও এই ধরনের গানের প্রয়োগ ঘটতে লাগলো। এতদিন যে বাংলা গান মূলত ছিল সংগীত সমঝদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবার তা আধুনিক বাংলা গানের রূপে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আপামর বাঙালির ভেতরে। বিষয়গত ভাবে 'প্রেম'-এর প্রাধান্য থাকলেও, সেইসময়ের বহু আধুনিক বাংলা গানে সমাজচেতনার ছাপও পড়েছে স্পষ্ট ভাবে। এই নিবন্ধে আমরা সেই ধরনেরই কিছু গানের দিকে লক্ষ্য দেবার চেষ্টা করবো।

আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়ায় স্বাধীনতার আগে অবধি যেসব গীতিকার উঠে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান চারজনের দিকে চোখ দেওয়া যাক। দেখা যাক তাঁদের লেখায় নানারকম বিষয়ের সঙ্গে সমাজচেতনার প্রতিফলনও কীভাবে ঘটেছে বেশকিছু গানে।

প্রথমেই বলতে হয় অজয় ভট্টাচার্যের কথা। কাব্যগীতি বা আধুনিক বাংলা গানের সূচনাপর্বের অন্যতম প্রধান গীতিকার। এসেছিলেন কুমিল্লা থেকে। কবিখ্যাতি তাঁর তখনই যথেষ্ট। ভাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা'-র নিয়মিত লেখক ছিলেন। গীতিকার হিসেবেও বেরিয়ে এলো অসামান্য কবিসত্তা। তাঁর লেখা অনেক গানের মধ্যে, বেশকিছু গানে উঠে এসেছে সমাজচেতনার কথা। ১৯৩৫ সালে 'বিদ্রোহী' ছবিতে লিখলেন, 'মুক্তি-পাগল আয়রে আয়/আয় বীরদল আয়রে আয়/মরণ তোদের ডাকছে আজ/আয় পরে সব বীরের সাজ...'। হিমাংশু দত্তের সুরে, 'চারণকবি'-র ভূমিকায় ছবিতে অভিনয় করে গানটি গাইলেন শচীন দেব বর্মণ। ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই আহ্বান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৮ সালে প্রথমবার হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। দিলীপকুমার রায়, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের সুরে গাইলেন একটি গান। লিখলেন অজয় ভট্টাচার্য —

*ত্রিংশকোটির অন্তরনিধি জয় হোক তব জয়*
*বাজাও সারথি শঙ্খ তোমার দূর করো ছায়াভয়*
*দুঃখজয়ের তিলক পরেছ*
*ব্যথা-কণ্টকে মুকুট লভেছ*
*হানিল যে শিলা তারে দাও মালা এ যে*
*চিরবিস্ময়!...*
*মরণের ভয়ে মরেছিল যারা*
*মৃত্যুবিজয়ী হল আজ তারা*
*ঐন্দ্রজালিক তোমার ইন্দ্রজালে*
*সর্বহারার মরুভূমি মাঝে মুক্তিসাগর জাগালে*
*তোমার বজ্রতালে।*

'শাপমুক্তি'(১৯৪০) ছবিতে অজয় ভট্টাচার্য লিখলেন, 'একটি পয়সা দাও গো বাবু/একটি পয়সা দাও/ময়লা জুতো সয়না পায়ে/পালিশ করে নাও... একটি পয়সা তোমার কাছে/সে কিছু নয়/কী দাম আছে/আমার সে তো রাজার মানিক/মুখের পানে চাও'। 'অধিকার'(১৯৩৯) ছবিতে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া/তাদের আবার দুঃখ কী রে/হাসবি তোরা/বাঁচবি তোরা/মরণ যদি আসেই ঘিরে...', 'ডাক্তার'(১৯৪০)ছবির 'যবে কণ্টকপথে হবে রক্তিম পদতল/অন্তরে ফুটিবে সে সুন্দর শতদল/ দুঃখের লিপিলেখা বিচ্ছেদ কালিমায়/উজ্জ্বল হবে জানি মিলনের চাঁদিমায়/বন্ধন মাঝে মোর মুক্তির কোলাহল...'। ১৯৪৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'ছদ্মবেশী' ছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের কলম থেকে বেরিয়ে এলো প্রেরণা জাগানোর গান, 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে/জোয়ার এসেছে আজ... পিছনে থাক পুরনো পৃথিবী/নতুন ফসল ভাগ করে নিবি/ আজিকার এই কাঁটার মুকুট/হবে রে জয়ের তাজ...'। অসামান্য কবিসত্তা ও সমাজ-সচেতনতার আদর্শ মিলনরূপের প্রকাশ এইসব গান।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী আরেক উল্লেখযোগ্য গীতিকার হলেন শৈলেন রায়। তাঁর লেখা বেশকিছু গানেও ধরা পড়েছে সময়ের ছবি। 'জাগে হিন্দুস্থান' শিরোনামে লেখা দুটি গান, 'সূর্যলোকের দেশ গাহে আজ সূর্যোদয়ের গান...' ও 'নব এশিয়ার কণ্ঠমণির মধ্যমণি এ দেশ/যুগ যুগ ধরি পৃথিবীরে দিলো/ আলোকের নির্দেশ...'। গাইলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে, 'শান্তি দাও/শান্তি দাও/ দেহ দেহ শান্তি হে/জর্জরিত বিশ্বলোকে/নাশি ভয় ভ্রান্তি হে...'। দেশভাগের চরম মাশুলের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এলো, তার প্রতিক্রিয়ায় শৈলেন রায় লিখলেন, 'যদি দেশ স্বাধীন হল/ও তুই স্বাধীনতার কী কী পেলি দান...' এবং 'তোর ভাঙা বীণা ধুলায় ফেলে/কাঁদিস না রে ও অভাগা...'। 'স্বামী স্ত্রী'(১৯৪০) ছবির 'বন্ধনহারা এই বন্ধুর পথ/ নিদ্রিত অজগর সর্পের প্রায়/সুপ্তি যে ভাঙে তার/ যাত্রীর রথ/ ছন্নছাড়ার দল/গান গেয়ে যায়...'। ১৯৪৪ সালে 'উদয়ের পথে' ছবির 'চল বীর চল বীর/উদয়ের পথে যেথা/শেষ হবে রজনীর... ধনিকের বণিকের/নিষ্ঠুর বন্ধন/ভেঙে ফেল/ থেমে যাক মানুষের ক্রন্দন/আকাশে উঠুক তব/ সাম্য পতাকা নব/স্বার্থের পরাজয়ে/জয় হোক শান্তির...'। ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'সমাপিকা' ছবিতে তাঁর লেখা গান সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে দিলো আলোর বার্তা- 'আঁধার ভাঙা আলোর পানে/কে জাগে/সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে কে জাগে/ আমরা জাগি নতুন যুগের ভোর হল...', 'মানুষের মনে ভোর হল আজ/অরুণ গগনতল/আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে/আলোকতীর্থে চল...ও রে সবার লাগিয়া প্রাণ রে/সবার লাগিয়া গান/তাই জীবনেরে ভালোবাসিয়া/মোরা জীবন করিব দান...'। 'বাবলা'(১৯৫১) ছবির 'দুখের কাছে হার মেনে তোর/হৃদয় কভু হারবে না...বারে বারে দুঃখ তোরে আঘাত দিয়ে/দুঃখজয়ের নেশা শুধু যায় জাগিয়ে/ বজ্র হেনে ভয় দেখালেও/পরাণ তো ভয় মানবে না...'। দুটি বেসিক গানে শৈলেন রায়ের লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগের কথা- 'তোরা যে জাত বাঙালি/নোস কাঙালি/সেই বাঙালি/ডরাস কারে...' এবং দ্বিতীয় গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'দেশ ভেঙেছে তাই বলে কি/জাত বাঙালি ভাঙবে রে/ ওই জাতভাঙা কল ধূলায় ফেলে/জাত বাঙালি জাগবে রে...উলটে ধরে আগুন জ্বালা মশালটারে/ কে আগুনের উর্ধ্বগতি রুখতে পারে/মেঘ জমেছে/ তাই বলে কি/ সুর্য ওঠা থামবে রে...'। গানদুটি কমল দাশগুপ্তের সুরে, ১৯৫০ সালে প্রথমে রেডিয়োতে গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। যা অনেক পরে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। শৈলেন রায়ের লেখা এরকম আরও বেশকিছু গানের কথা বলা যায়।

এবার আসা যাক প্রণব রায়ের কথায়। ইনি বরেণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশ্বদূত' পত্রিকায় 'কমরেড' নামে কবিতা ও প্রবোধ সান্যালের 'স্বদেশ' পত্রিকায় একটি গল্প লেখার ফলে, ব্রিটিশ সরকারের রোষনজরে পড়েন এবং তাঁর এক বছরের কারাবাস হয়। জেল থেকে বেরিয়ে কাজী নজরুলের অনুপ্রেরণায় গান লিখতে শুরু করেন। পাশে পান বন্ধু সুরকার কমল দাশগুপ্তকে। এরকম একজন সংগ্রামী মানুষের কলম থেকে অন্যান্য গানের পাশাপাশি বেশকিছু গানে যে সমাজ-রাজনীতির প্রতিফলন ঘটবে, তা তো স্বাভাবিক। ইনি বোধহয় ১৯৩০ দশকে উঠে আসা একমাত্র আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার, যিনি ১৯৭০ দশক অবধি, একটানা সাফল্যের সঙ্গে গান লিখেছেন। সময়ের দাবী অনুযায়ী যেমন পালটেছে তাঁর কাব্যপ্রকৃতি, তেমনি সমসাময়িক সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে অনেক গানে। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে প্রণব রায়ের লেখা, 'প্রণয়ের গান গাহিতে বোলো না আর/ আজ বাংলার পুরব দিগন্তে/রোদন উঠেছে ভরে/ যেথা অত্যাচারীর অগ্নিশিখায়/কত খেলাঘর ছাই হয়ে যায়/ পদ্মার বুকে কত জীবনের/পদ্ম গেল যে ঝরে...'। কমল দাশগুপ্তের সুরে ১৯৫০ সালে গাইলেন সত্য চৌধুরী। একই বছর গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গান, 'মরণপথের যাত্রী ওরে জীবনপথে চল...'। ১৯৪৭ সালে নিজের কাহিনি ও চিত্রনাট্যে তৈরি 'মন্দির' ছবির একটি গানে প্রণব রায় হাহাকার করে উঠলেন ক্ষুধাপীড়িত মানুষের জন্যে- 'ম্যায় ভুখা হুঁ/ এ মহাক্ষুধার শ্মশানে আজি জেগেছে/জেগেছে রে মহাকাল/ আকাশে আকাশে বেজে ওঠে ওই/মৃত্যুর করতাল...'। ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রেশ কমবেশি তখনও চলছে। দেশভাগের ফলে শরণার্থীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার চিত্র চারপাশে। তারই তাড়নায় বেরিয়ে এলো এই

গান। সুবল দাশগুপ্তের সুরে গাইলেন সত্য চৌধুরী। সঙ্গে ছিল সমবেত কণ্ঠের প্রয়োগ। যাতে গলা দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতো স্বনামধন্যেরা। স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ দশকের শেষ থেকে ১৯৬০ দশকের অনেকটা সময় অবধি হওয়া খাদ্যসংকটকে ঘিরে আন্দোলনে উত্তাল ছিল কলকাতা। ১৯৬৪-তে যা ভালোরকমভাবে চলছে। এই বছর মুক্তি পাওয়া 'দীপ নেভে নাই' ছবিতে প্রণব রায়ের একটি গানে পড়লো সেই সময়েরই ছাপ- 'ও ভগবান রুটি দাও/মুখের পানে একটু চাও/উপবাসীর কান্না কি আজ/আকাশ থেকে শুনতে পাও... দুটি বেলা খেতে পাবো/গরীবলোকের এই তো আশা/খিদে আছে নেই কো খাবার/ কেমনধারা এ তামাসা/মালিক তুমি/রাজা তুমি/ লোকে তোমায় দাতা বলে/দাও না দুখান শুকনো রুটি/ভিজিয়ে নেবো চোখের জলে...'। ১৯৭০ দশকের আলোড়িত সময়ের প্রভাবও দেখা গিয়েছিল প্রণব রায়ের লেখায়। 'বহুরূপী'(১৯৭২) ছবিতে লিখলেন, 'শান্ত আকাশ/চাই না তো/আমি দুনিয়াতে ঝড় আনবো/যেথা বঞ্চনা আর স্বার্থ/সেথা কঠিন আঘাত হানবো...'। 'দুরন্ত জয়'(১৯৭৩) ছবির এই গানটিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, 'আমরা সবাই এই দুনিয়ার/খেটে খাওয়া মানুষ ভাই/একই জাতের মানুষ মোরা/উঁচুনিচু তফাৎ নাই...জমানা বদলে গেছে/ভোর হতে আর নেই যে দেরি/দুনিয়ায় জয় হয়েছে/খেটে খাওয়া মানুষদেরই...'। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কীভাবে তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও সমাজসচেতনতাকে নিয়ে এগিয়েছেন প্রণব রায়, এইসব গান তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯৪৩ সালে কমল দাশগুপ্তের সুরে রেকর্ডে গাওয়া কুমারী কুসুম গোস্বামীর গাওয়া একটি গানের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা গানের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর। এমন একজন গীতিকার এলেন, যিনি অচিরেই গান রচনায় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আজও নিজেকে আলাদা করে রাখতে পেরেছেন। নানা ধরনের গান লিখলেও, মোহিনী চৌধুরী অনন্য হয়ে ওঠেন এক বিশেষ ধরনের সমাজচেতনামূলক গানে। যেখানে ইনি মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির অনুপ্রেরণায় সমষ্টির অনুভূতির সন্ধান করে, তাতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। আবার কোনও সময় নিয়ে এসেছেন মানুষের সংকটমুহূর্তে তাঁর প্রেমময় স্মৃতিকাতর কিছু মনে-পড়া। বাঙালির মন-কেন্দ্রিক বেঁচে থাকার সঙ্গে গানগুলির আবেদন যেন একাকার হয়ে গেছে। যেখানে বাংলার মানুষের অন্তর-বাহিরের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এরকমই কিছু গান- 'পৃথিবী আমারে চায়/রেখোনা বেঁধে আমায়/খুলে দাও প্রিয়া/খুলে দাও বাহুডোর... সবার মনে দীপালি জ্বালাতে/যে দীপ আপনি জ্বলে/কেন আর তারে ঢেকে রাখো বলো/তোমার আঁচলতলে...', 'জেগে আছি একা/ জেগে আছি কারাগারে/কুয়াশায় ঘেরা নবমীর চাঁদ/ জাগিছে আকাশ পারে... তুমিও কি প্রিয়া/রয়েছো জাগিয়া/শূন্য শয়নতলে/সারা পৃথিবীর বেদনা ঝরিছে/তোমার নয়নজলে/পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত/মুক্তির পথে কত বাধা/কত রক্ত/ মহামিলনের স্বপ্ন আমার ভেঙে যায়/বারে বারে...' , 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়/তুমি যে বহ্নিশিখা/মরণের ভালে এঁকে যাই মোরা/জীবনের জয়টীকা...দুশো বছরের নিঠুর শাসনে/গড়া যে পাষাণবেদী/নতুন প্রাণের অঙ্কুর জাগে/তারি অন্তর-ভেদী...'। এরকমই আরও বলা যায়, 'ভেঙেছে হাল/ছিঁড়েছে পাল...', 'যাঁদের জীবনভরা শুধু আঁখিজল/আমি যে তাদেরই দলে...', 'তখনও ভাঙেনি প্রেমের স্বপনখানি/ আমার এ বুকে ছিল প্রিয়া/ছিল রানী/আজ যতদূরে যাই/আছে শুধু এক ক্ষুধিত জনতা/প্রেম নাই/ প্রিয়া নাই...', 'জয় হবে হবে জয়/মানবের তরে মাটির পৃথিবী/দানবের তরে নয়...'(ছবি- 'মানে না মানা') ইত্যাদি। মোহিনী-বাণীতে গড়ে ওঠা দেশভাগ নিয়ে একটি গান দেশহারানো বাংলার মানুষের মনের ভেতরে ঢুকে যেভাবে তাকে অস্থির করে দিতে পারে, অনেক সমস্বরে গাওয়া প্রতিবাদী গানও বোধহয় সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে না- 'সেই যে দিনগুলি/বাঁশী বাজানোর

দিনগুলি/ভাটিয়ালির দিনগুলি/বাউলের দিনগুলি/ আজও তারা পিছু ডাকে/কুলভাঙা গাঙের বাঁকে/ তালসুপারির ফাঁকে ফাঁকে/পিছু ডাকে...'। তবে যে গানের কথা উল্লেখ না করলে, মোহিনী চৌধুরীকে নিয়ে যেকোনও কিছু বলাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেটি হল, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে...'। এ গানের মাঝখানে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'-র আবেদন নিয়ে এসেছেন গীতিকার- 'যাঁরা স্বর্গগত/তাঁরা এখনও জানে/স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি/এসো স্বদেশব্রতের/মহাদীক্ষা লভি/ সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি...'। এর পর কি আর এ গান চিরকালের অন্যতম দেশাত্মবোধক গানের মর্যাদা না পেয়ে পারে? মোহিনী চৌধুরী ভাবনাচিন্তার দিক থেকে প্রগতিবাদী ছিলেন। কিন্তু সেই অর্থে কোনও রাজনৈতিক দল বা তার প্রভাবান্বিত কোনও সংগঠনের সঙ্গে সেভাবে যুক্ত থাকেননি। শুধুমাত্র বেহালায় 'প্রগতি কৃষ্টি পরিষদ' গঠনের পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বরাবর থেকেছেন আদ্যোপান্ত সাবেকি বাঙালি সত্তায় পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে মগ্ন ছিলেন। চিরকাল ভক্তি ও প্রেমের পথে থেকেই তাঁর সমাজসচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন গানে। যার ধরন একান্তই মোহিনী চৌধুরীর নিজস্ব। তাঁর গানে গণজাগরণ ও গণমানস একাকার হয়ে মিশে গেছে।

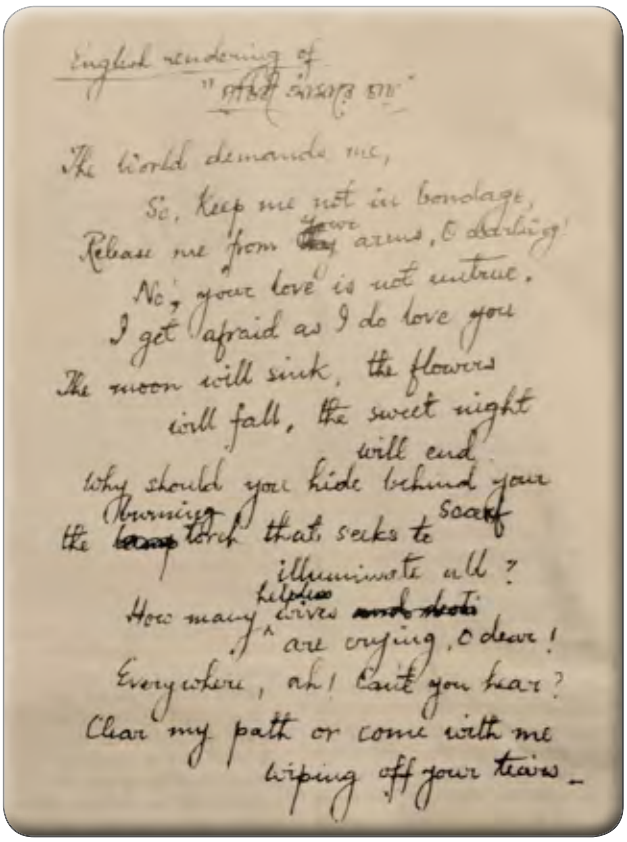

পরাধীন ভারতে উঠে আসা আধুনিক বাংলা গানের এই চারজন বিশিষ্ট গীতিকারের গানের বাইরেও সেইসময়ের আরও কয়েকজনের গানের উল্লেখ দরকার। যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক চিত্র। ১৯৪৩-এর মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ নিয়ে দুটি গান লিখে সুর বসালেন তুলসী লাহিড়ি, 'এলো কাল পঞ্চাশের আকাল...' এবং 'বাঙাল দেশের কাঙাল চাষী...'। রেকর্ডে গাইলেন কমলা ঝরিয়া। দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে গিরিন চক্রবর্তী নিজের কথায় ও সুরে গাইলেন, 'শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজও আছে ভাই/ আমি যাবো আমার দেশে/সোজা রাস্তা নাই/বাড়ি ছিল নারায়ণগঞ্জে/ ব্যবসা করতাম বাখরগঞ্জে/ছিল কিছু মানিকগঞ্জে/ভাবি বসে তাই...'। এ গান শুনলে, যে কোনও দেশহারানো মানুষের বুকটা ফেটে যে চৌচির হয়ে যাবে, তা কি আর বলতে হয়? ১৯৪৩/৪৪/৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে টালমাটাল কলকাতার ছবি যেভাবে উঠে এসেছে ডাক্তার যশোদাদুলাল মণ্ডলের নিজের কথায় ও সুরে গাওয়া দুটি অভিনব


English rendering of
"পৃথিবী আমারে চায়"

The World demands me,
So, Keep me not in bondage,
Release me from your arms, O darling!
No, your love is not untrue.
I get afraid as I do love you
The moon will sink, the flowers
will fall, the sweet night
will end
Why should you hide behind your
scarf
the burning torch that seeks to
illuminate all?
How many helpless lives
are crying, O dear!
Everywhere, ah! Can't you hear?
Clear my path or come with me
wiping off your tears _

মোহিনী চৌধুরীর হাতের লেখায় "পৃথিবী আমারে চায়..." গানের ইংরেজি অনুবাদ।

ব্যঙ্গগীতিতে, তার কোনও তুলনা নেই। এক অদ্ভুত বাণীচয়ন, তার সঙ্গে সেইরকম সুররচনা ও অভিনব গায়নভঙ্গি। কিন্তু গানদুটি থেকে ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার প্রতিফলিত হচ্ছে সংগীতকারের সমাজসচেতনতা ও রাজনৈতিক বোধের আভাস। প্রথম গান- 'ক্যালকাটা নাইনটিন ফর্টি থ্রি অক্টোবর/এআরপি মিলিটারি/আর পথে পথে ভিখিরি/অ্যাক্সিডেন্ট আর ক্রাউড/কন্ট্রোল পারমিট ব্ল্যাকআউট/আর সব জিনিসের বাড়লো দর...চাল ডাল তেল আটা ময়দা/কন্ট্রোল হয়েছে/বাড়ির বউরা রাস্তায় নেমে/লাইন দিয়েছে/ কন্ট্রোল কন্ট্রোল/ চলতে ফিরতে কথা কইতে কন্ট্রোল/সব তাতেই কন্ট্রোল/শ্বশুরবাড়ি যাওয়া কন্ট্রোল করো ভাই/ঘন ঘন যেতে হলে/পারমিট কার্ডটি চাই...'। দ্বিতীয় গানের সময়টি ১৯৪৫-এর প্রেক্ষাপট। সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমেছে। তখনকার বিশ্ব-রাজনীতির অবস্থা সংগীতকারের মনে লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলেছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে গানটিতে- 'টেন ইয়ার্স ব্যাক ক্যালকাটা/সে সময়টা যে নাই/নাউ নাইটিন ফর্টিফাইভ/একটু সামলে চলো ভাই/ক্যাপিটালিজম্ কেউ মানে না আর/চায় শুধু ডেমোক্র্যাসি/ চায় সোসিয়ালিজম্ আর বলশেভিজিম্/নাৎসিজমের চায় ফাঁসি/এলো রে ওয়াভেল অফার/হল সিমলা কনফারেন্স/গেইন লস্ ব্যোম কালীই জানে/ দ্যাট ইজ্ দ্য ফিউচার টেন্স...'। মনে রাখতে হবে, এ গানের রচয়িতা ও গায়ক যশোদাদুলাল মণ্ডল কিন্তু পেশায় একজন ডাক্তার ছিলেন। থাকতেন উত্তর কলকাতায়। কোনও রাজনৈতিক তকমা বা কোনও মতাদর্শের সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবনা থেকে তাঁর অত্যন্ত স্পষ্ট রাজনৈতিক বোধের প্রকাশ ঘটছে গানের মাধ্যমে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু ইনিই নন, এতক্ষণ উল্লিখিত বেশকিছু গানের সংগীতব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাহলে এ কথা বলাই যায়, আধুনিক বাংলা গানে(নন ফিল্ম ও ফিল্ম) শুধু প্রেম-বিরহের কথাই বলা হয়নি। তাতে নিয়মিত ভাবে পড়েছে সমাজচেতনার ছাপ। এই নিবন্ধে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের কিছু গীতিকারের গান নিয়ে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। যা নিতান্তই এক আংশিক চিত্র। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক গীতিকারের এই ধরনের গানের ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে আধুনিক বাংলা গান ও ছায়াছবির গানের দুনিয়ায়। যা বলতে গেলে পুস্তক-পরিসরের প্রয়োজন। একটা কথা মনে রাখা দরকার, আধুনিক গানের জগতের সৃষ্টিকারীদেরও সবায়ের মতোই বিভিন্ন অশান্ত সময় পার করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাঁদের জন্যে আলাদা কোনও নির্ঝঞ্ঝাট আবাসস্থল ছিল না। তাই তাঁদের গানেও যে নানারকম সামাজিক অবস্থার ছবি ফুটে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে আরও অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। যা থেকে উন্মোচিত হতে পারে সমাজতত্ত্বের কোনও নতুন দিক।

**তথ্যঋণ :**


১) 'কাজীসাহেবের গান : সঙ্গপ্রসঙ্গ'—প্রণব রায়( 'শহর' পত্রিকা বাংলা গান সংখ্যা, প্রতিভাস, এপ্রিল ২০১২)

২) 'মোহিনী চৌধুরীর স্মরণীয় গান'(বহুলা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২)

৩) 'শৈলেন রায় : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি'(সম্পাদনা : শ্যামল সেনগুপ্ত, ২৮ চৈত্র ১৪১১ বঙ্গাব্দ)

৪)'গীতিকার মোহিনী চৌধুরী'— লীলা চৌধুরী('গানের জগৎ' পত্রিকা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

৫)'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি' ১— জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়(প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০০৪)

৬) 'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি' ২— জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়(প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০০৯)

৭)'আধুনিক বাংলা গান-এর বিবর্তন'— অভীক চট্টোপাধ্যায়(অনুষ্টুপ পত্রিকা, প্রাক শারদীয় সংগীত সংখ্যা, বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৪, ২০১৪)

৮)'আধুনিক বাংলা গান : চার গীতিকার'— অভীক চট্টোপাধ্যায়(আধুনিক বাংলা গানে কথা, সম্পাদনা: অলক চট্টোপাধ্যায়, আজকাল, জানুয়ারি ২০১৫)


কৃতজ্ঞতা ঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত রায়, দিগ্বিজয় চৌধুরী ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত

# গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়

**সত্যজিৎ দাসগুপ্ত**
**অধিকর্তা, লিগ্যাল এড সার্ভিসেস, পশ্চিমবঙ্গ**

**উপক্রমণিকা**

এই লেখাটি ত্রিস্তরীয় চিন্তা ও কাজের এক মোহনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে পাঠকদের:১) স্মৃতিমেদুরতা জনিত আবেগে জারিত ষাটোত্তর বাঙালি মধ্যশ্রেণীর এক পুরুষের সাঙ্গীতিক স্মৃতিকথা; ২) ওই মানুষটিরই সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস বোধ ও গবেষণালব্ধ যুক্তি-বুদ্ধির কুঠারে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত সংগীত ও ছায়াছবি সংক্রান্ত এক বিশ্লেষণ এবং ৩) স্মৃতি রোমন্থন ও বিচার-বিশ্লেষণের উপরোক্ত কাজদুটির এক বেণীবন্ধের উপস্থাপন। প্রচেষ্টা থাকবে সৃজনশীল ও প্রতিপাদ্যমূলক গদ্যের সমাহারে লেখাটিকে আবেগায়িত বুদ্ধির ছোঁয়ায় রঞ্জিত করে তুলে ব্যাক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতিচর্চার এক চলমান অববাহিকায় ভাসিয়ে দেওয়ার। এমন একটি চলমানতাকে মূর্ত করে তোলার যাকিনা আমার ছেলেবেলা থেকে যৌবন হয়ে আজও প্রৌঢ়ত্বের মাঝে নিরন্তর খুঁজে ফিরছে এমন কিছু গান আর ছায়াছবির "জাদুকরী অবশেষ (magical residue)" [এই ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন মার্ক্সবাদী অস্ট্রিয়ান শিল্প ও সংস্কৃতি তাত্ত্বিক Ernst Fisher] যার সবটুকু ওতপ্রোত হয়ে আছে এক কিংবদন্তি বাঙালী নায়িকা আর এক কালজয়ী বাঙালী গায়িকার সৃষ্টি সম্ভারে।

॥ এক॥

সুচিত্রা সেন আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একসাথে আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে এই মুহূর্তে আমাকে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৬০'র দশকের মাঝামাঝি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল'র মাঠে সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যায় লম্বা দুটো বাঁশের মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে তৈরী করা স্ক্রিন'র ওপর সাদাকালো সিনেমায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়'র গানে লিপ দিচ্ছেন সুচিত্রা সেন - 'তুমি কি সে তুমি নাও, সবই আজ নতুন নতুন লাগে, কি যেন স্বপ্ন মায়ায়, দোলে মন দোদুল দোদুল রাগে' - খুবই আবছা একটা স্মৃতির রেশ যা সেই আমলে মনে এমন কোনো দাগ নিশ্চয়ই কাটেনি। কিন্তু আজ এই লেখাটি লিখতে বসে এই স্মৃতিটা জেগে উঠছে নতুন করে। বলা ভালো, আমি জাগিয়ে তুলছি। এই সিনেমাটা - স্মৃতিটুকু থাক' - আরো একটু বড়ো হয়েও দেখেছি যখন এই দুই শিল্পীকে নিয়ে আমার ভাবনা কিঞ্চিৎ ডালপালা মেলে ধরতে শুরু করেছে এবং যখন ১৯৭০'র দশকে পৌঁছে 'পথে হলো দেরী' ছবিটির অবিস্মরণীয় সেই গানটি, 'এ শুধু গানের দিন এ লগোনও গানে শোনাবার', মন টেনে রাখছে অবশ্যই বেশ খানিকটা ওই 'সন্ধ্যা-সুচিত্রা' ম্যাজিকের আবেশে, কিন্তু সেই সঙ্গে দৃশ্যের বাস্তবতা, অভিনয়ের বাহুল্য এবং গানের কথার অপ্রতুলতা নিয়েও বিবিধ তর্কেও নিজেকে জড়াতে শুরু করেছি। তবে ওই সময়েরই সামান্য আগেপরে 'উত্তর ফাল্গুনী' ছবিতে সুচিত্রা অভিনীত পান্না বাঈজী'র মুখে মার্গ সংগীতে পারদর্শী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান - 'কোন তারাহ সে তুম খেলত হোলি' - মনকে অবশ করে রেখেছে অবলীলাক্রমে। সেই আবেশটুকু যুক্তি-বুদ্ধি বিরোহিত থাকেনি মোটেই।

সুচিত্রা-সন্ধ্যা জুটির জয়জয়কারের কথা নানান পর্বে নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে বাঙালী দর্শককুল সম্মোহিত হয়েছে তার অমোঘ আকর্ষণে। আমার মনে পড়ছে, 'সপ্তপদী' ছবিটির সেই দৃশ্যের কথা - কৃষ্ণেন্দুর জন্যে অপেক্ষারত রীনা ব্রাউন ড্রইংরুম'এ ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে গুন্ গুন্ করে গাইছে সেই iconic গানটি। সুচিত্রার নানান ভঙ্গিমায় কি অসাধারণ প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল সন্ধ্যার গানের সূক্ষাতিসূক্ষ নাটকীয়তায়। কিংবা মনে করা যেতে পারে 'অগ্নিপরীক্ষা'র সেই অনবদ্য গানটি - গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু ,যে পেলব সুরমূর্ছনায় আপ্লুত হতেন আমাদের দিদি-বৌদিরা। কেমন যেন একটা 'কি করে বোঝাই গিয়েছে কোন পৃথিবী হারিয়ে' ভাব। কল্পনাবিলাসের নম্র প্রকাশ রোমাঞ্চের দ্বিধায়। সুচিত্রা সেনের মুখে ছবির পর্দায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শুনতে বাঙালি দর্শক এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে 'দীপ জ্বেলে যাই' ও 'সাত পাকে বাঁধা' ছবি দুটিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান না থাকার ব্যাপারটা অনেকেই ঠিক মেনে নিতে পারেননি। আমার এক দিদি বলেই বসেছিল যে 'সুচিত্রা সেনের অভিনয় তো ভালো হবেই কিন্তু সন্ধ্যার গান না থাকায় গোটা ব্যাপারটা বড্ডো ন্যাড়ান্যাড়া লেগেছিলো শেষমেশ'। বেশ কয়েক বছরের ব্যাবধানে সুচিত্রা সেন যখন আবার অভিনয় করতে শুরু করলেন তখন ১৯৬৯'এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'কমললতা' ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া কীর্তনাঙ্গের গানগুলি আবারো ফিরতে শুরু করলো দর্শকদের মুখে মুখে। ১৯৭১'এ 'নবরাগ' ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব গায়কীতে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান' পেলো এক নতুন মাত্রা সুচিত্রার লিপে। তার অল্প পরেই ১৯৭৪'র 'শ্রাবন সন্ধ্যা' ছবির সেই বিখ্যাত গানটি - দু চোখের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে - যদিও সুচিত্রা সেন তখন আর তাঁর আগের ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হতে সক্ষম ছিলেননা। ওই বছরেই মুক্তি পেয়েছিলো 'দেবী চৌধুরানী'। বজরায় বসে গাওয়া সেই গানটি - ওগো এস হে আমার রাজাধিরাজ - অভিনয় জীবনের অস্তাচলে পৌঁছে সুচিত্রা সেন গানটিকে যেন এক ধ্যানমগ্না সম্রাজ্ঞীর প্রত্যয়ী সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

॥ দুই॥

১৯৫০ আর ৬০'র দশকে আমার ছেলেবেলায় আর আমাদের দিদিবৌদিদের মেয়েবেলাতেও কিন্তু আধুনিক বাংলা গান আর বাংলা ছায়াছবিতে তার প্রয়োগ নিয়ে ঘ্যানঘেনানির এবং একঘেয়েমির কথা উঠেছে। সুচিত্রা-সন্ধ্যা জুটির জনপ্রিয় গানগুলিকেও এই কারণেই ব্রাত্য করে রাখার নিরলস প্রয়াস চালু থেকেছে এই গোটা সময় জুড়েই। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন বোদ্ধা সমালোচক ও শ্রোতারা এইসব গানের মধ্যে 'চাঁদ-ফুল-তারার' ন্যাকান্যাকা আর বোকাবোকা প্যানপ্যানানি খুঁজে পেতেন। আই.পি.টি.এ-খ্যাত সলিল চৌধুরীর অন্ধ ভক্ত আমার এক মার্ক্সবাদী মামা অত্যন্ত আক্ষেপের সুরেই একবার বলেছিলেন, 'সুসজ্জিত বাগানে গাছগাছড়ার চারধারে ঘুরে ঘুরে নৃত্যরত হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকাদের মুখে গান ভোরে দেবার কাজটা যে উনি কেন নিতে গেলেন তা আমার কখনোই বোধগম্য হয়নি'। এই মামাকে দেখতাম প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে রেডিও'র সামনে বসে দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনতে। বহুকাল আগে আমার মাস্টারমশায় অর্থনীতির অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞানী অশোক সেনকে সুচিত্রা-সন্ধ্যা আর উত্তম-হেমন্ত জুটি দুটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম জনপ্রিয় রোমান্টিক বাংলা গান ও বাংলা ছায়াছবির পরিব্যাপ্ত মিলমিশের সন্দর্ভে। ওঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্র গাম্ভীর্যে অকপটেই বলেছিলেন: 'আমরাতো এই ব্যাপারগুলোকে একটু খাটো চোখেই দেখতাম, বিশেষ করে পথের পাঁচালী ইত্যাদির 'realistic cinema' সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার পরিসরে তো এগুলো অনেকটাই অন্তেবাসী হয়েই থেকে গিয়েছিলো'। এই কথাগুলো কিন্তু আমি মোটেই সাজিয়ে লিখছিনা। ওঁর সাক্ষাৎকারটি দেখে নিয়েই উধৃত করলাম। উনি বলতেন, 'এক

এক সময় ভেবেছি যে অভিনয়ের বাড়াবাড়িটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একথাটা বোধহয় খানিকটা মেনেই নেওয়া যাবে যে গানগুলোর কিন্তু একটা 'physical robustness' ছিল। অন্যদিকে সমান্তরালভাবেই সদর্পে বিদ্যমান ছিল আপামর তথাকথিত "নিম্নকোটির" (এখন অনেকেই এখানে 'নিম্নবর্গ' শব্দটিও ব্যবহার করতে চাইবেন) জনপ্রিয় শিল্প-সংস্কৃতির ধজ্বাধারীরা। জনপ্রিয় রুচি, জনপ্রিয় চাহিদা এবং জনপ্রিয় প্রতিক্রিয়ার নানান মতামত।

এইযে পরস্পর-বিরোধী দুটি মত বা ভালোলাগা বা মন্দলাগা, তার মুলে কিন্তু রয়েছে ওই একঘেয়েমির ভাবনাটাই। শুনে শুনে কান পচে যাওয়াও বলা যেতে পারে। বিরক্ত লাগতে শুরু করা। রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ বিফল হওয়া। আবার এসবেরই উল্টোপিঠে থাকে বার বার শুনতে শুনতে এক ধরণের ভালোলাগা ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধে অভ্যস্ত হয়ে পড়া। সত্তর দশকের শেষ ও আশির দশকের গোড়ায় আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (কিম্বা বলা উচিত তারও বেশ কিছুকাল আগে থেকেই) তখন একদিকে যেমন চুটিয়ে বাংলা আধুনিক আর হিন্দি ছবির গান শুনেছি, অন্যদিকে ঠিক ততটাই আগ্রহ আর উচ্ছাস নিয়ে সংস্কৃতির জনমুখীনতা, নানান ধরণের শিল্পকর্ম ও শৈল্পিক ঐতিহ্যের ইতিহাস ও সামাজিকতা এবং শিল্পকলার বাজার, উচ্ছকটির রুচিবোধ আর শিল্পকর্মের প্রযুক্তিগত পুনরুৎপাদন (technological reproduction) নিয়ে বিবিধ তর্কবিতর্কের জালেও নিজেকে জড়িয়েছি। ছায়াছবি আর গানবাজনার বামপন্থী / মার্ক্সবাদী আলোচক ও সমালোচকেরা তখন বলেছেন, ভালো গানের সুর ও কথার সঠিক রসাস্বাদনের জন্যে উপযুক্ত সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সিনেমার ক্ষেত্রেও একই ভাবনা প্রযোজ্য হবে। এটাই ছিল উচ্চকোটির ধ্রপদী সঙ্গীত ও ছায়াছবি সংক্রান্ত চিন্তার মূল কথা। এরই বিপরীত মেরুতে জনপ্রিয় গানবাজনা ও ছায়াছবি সংক্রান্ত নানান বিষয়ের বিচারবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এসেছে জনরুচি, বাজার, প্রযুক্তির প্রভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মের কথা। যে তাত্ত্বিক মতটি এই প্রসঙ্গে তখন বিশেষভাবে ধার্য ছিল এবং যে মতের ধার ও ভার আজ অবদি এতটুকুও কমেনি, তার প্রবক্তা ছিলেন দুই প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক, Theodor W. Adorno ও Max Horkheimer , যাঁরা ১৯২০ ও ৩০'র দশকের ফ্রাঙ্কফুট বিদ্যতগোষ্ঠীর সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্বের ( Critical Social Theory) অগ্রণী প্রণেতাও ছিলেন।

এই মতটি "Culture ।ndustry Argument" নামেই সুপরিচিত। মোদ্দা কথাটা হোলো, জনপ্রিয় কোনো গান-বাজনা বা সাহিত্যরচনা বা যেকোনো শিল্পকর্মের সাথে সব সময় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে বাজার, ব্যবসা আর রুচিবোধের একঘেয়েমি বা রুচিহীনতার নানান বিষয়। এরই অপরদিকে বিরাজকরে সজাগ, সচেষ্ট এবং সাবলম্বী থেকে শিল্পকর্মের ভালোমন্দ বিচার ও উপভোগ করার ক্ষমতা যাকিনা আলোকপ্রাপ্ত উচ্চকোটিরই একচেটিয়া। এই যুক্তি অনুসারে, "Culture ।s captive of corporations that use music and dance, (and all other) performing arts to make profits" আর সেই মুনাফা তোলার কাজটিকে সুনিশ্চিত করার জন্যে আপামর দর্শক ও শ্রোতাদের চেতনায় উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবেই অভ্যস্ততার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রযুক্তির সাহায্যে একই ধরণের গানবাজনা বা ছায়াছবি তৈরী করার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। এই প্রসঙ্গে 'ফর্মুলা' বা 'মশলা' সিনেমার যে কথাটা উঠে আসে তা অনেকেরই জানা আছে। মূল ধারণাটা হোলো, "Culture as deception"এবং এখানে তেমন একটা কিছু না জেনেবুঝে শ্রোতারা বা দর্শকেরা নান্দনিকতায় সিদ্ধ বা সামাজিকতায় ঋদ্ধ উপযুক্ত কিছু শোনা বা দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা ঠকে যাচ্ছেন বা শিকার হচ্ছেন এইসব গান-সিনেমা ইত্যাদি যারা তৈরী কোরে বাজারে আনছেন তাদের সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের। আরও একজন জার্মান তাত্ত্বিকের লেখায় একই ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায় এবং আমাদের ছাত্রাবস্থায় বামমনস্ক সাংস্কৃতিক

কর্মীমহলে এই মানুষটির নাম অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হোতো - Walter Benjamin , যিনি "technological reproducibility"'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রযুক্তি কিভাবে যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন (mechanical reproduction) ঘটিয়ে একই ধরণের গান বা সিনেমায় নির্দিষ্ট শ্রোত্রী বা দর্শকমন্ডলীর রুচি, ভালোলাগা এবং বাছাবাছি করবার ক্ষমতায় স্থবিরত্ব ও সীমাবদ্ধতা এনেদিতে পারে সেকথাই আমরা পাবো এঁর বিচার-বিশ্লেষণে।

॥ তিন॥

ইত্যাকার যাবতীয় তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের উপযোগিতা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি যে অনুকরণ, অনুসরণ আর অনুরণন - রসসৃষ্টির সৃজনশীলতায় বা অন্য যেকোনো সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডের বহমান প্রক্রিয়ায় সবকিছু মিলেমিশেই তো থাকে। তাই সুচিত্রা-সন্ধ্যার শৈল্পিক যুগাবন্দিতে বাংলা ছায়াছবিতে গান আর অভিনয়ের যে সম্মিলিত রসোভাণ্ডার একদা উৎপাদিত হয়েছিল এবং আজও যাকিনা বাঙালি দর্শক চিত্তে উপচে পড়ে তানিয়ে আরও গভীর ও পরিব্যাপ্ত "দর্শক গবেষণা" করবার প্রয়োজন অবশ্যই ফুরিয়ে যায়নি আদৌ।শোপেনহাওয়ার-বিটোফেন'র সঙ্গীত এবং ফেলিনি-গদার-ত্রুফো-সত্যজিৎ রায়-কুরোসাওয়া ছায়াছবি রসসিক্ত উচ্চকোটির অধিকাংশ বাঙালি বোদ্ধা সমালোচকেরা এই গানকে মৌলিকভাবে চাঁদ-ফুল-তারার চটুল প্যানপ্যানানি বলেই মনে করেছেন। ব্যাক্তি ও সমাজ সচেতনতার যে কুঠারে তাঁরা মনের আবেগ এবং মননের সংবেদনশীলাকে ছিন্নভিন্ন করে থাকেন তার আঘাত সহ্য করে এই রসসৃষ্টি কোনোদিনই তাঁদের কাছে আধুনিকতার ছাড়পত্র পায়নি। এঁদেরই একজন আমাকে একবার একটি প্রশ্ন করেছিলেন - "তুমি বসে বসে ঠান্ডা মাথায় 'এ শুধু গানের দিন এ লগোন গান শোনাবার ' জাতীয় গান শুনে আনন্দ পাও?" আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই তিনি একথাও বলেছিলেন যে এইসব গানের রেশ একজন বুদ্ধিমান মানুষের মনে কি করে যে পাঁচ-দশ সেকেন্ডের বেশি থাকতে পারে সেটাই তিনি কখনো বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে সোনাটা আর সিম্ফনির পাশে বাংলা আধুনিক গানের যে কোনো জায়গা হবার নয় কখনো সে কথা মেনে নিতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। যার যেমন তার তেমন। অথচ এই মানুষটিকেই দেখেছি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম কথা রাখো মোর' গানটি শুনে মাতোয়ারা হয়ে যেতে। তখন মনে প্রশ্ন জেগেছে - এই নিমগ্নতার উৎসে কি থাকতে পারে: শিল্পীর কণ্ঠ? গায়কী নাকি রাগাশ্রয়ী সুরটি? নাকি এই সবকিছুরই এক বেণীবন্ধ? সুচিত্রা-সন্ধ্যার যে সংপৃক্ত গানের অন্তর্নিহিত নাটক আর তার পাত্রপাত্রীদের বারোমাস্যায় আমার-আপনার এবং আমাদের সকলের আমন্ত্রণ থেকেছে চিরটা কাল। যে যেমন শুনেছে আর যে যেমন বুঝেছে তাতেই তার ঘটেছে প্রাপ্তি। নিয়মনীতি আর প্রথা-পদ্ধতির কোনো তোয়াক্কা কেউ করেনি অবারিতদার এই রসাঙ্গনে। বোঝা আর না বোঝার মধ্যে কখনো থাকেনি কোনো লক্ষণরেখা আর তাই ভালোলাগার এবং ভালোলাগানোর নেশাটা ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে সময় থেকে সময়ান্তরে।

সুচিত্রা-সন্ধ্যার বাংলা গান আজও আমার সুখদুঃখ্যের সাথী। এই মুহূর্তে আর বিশেষ কোনো গান মনে পড়ছেনা। শুধু একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে স্মৃতিপটে - রাত ভোর হয়ে আসছে .....শীতের রাত ....মহাজাতি সদনের এক জলসায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গান ধরলেন 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়'...তখন আমি যুবক..... সেদিনের সেই গভীর নাটক, তার রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর কেমন যেন একটা পৃথিবী-হারানো বেদনার সুর আজও বুকের মধ্যে ঝড় তুলছে এই লহমায়..... মনে হচ্ছে, হারিয়ে গিয়েছে সে কোন এক বিদীর্ণ জীবন। এই হলো সুচিত্রা-সন্ধ্যা সৃষ্টিরসের সেই "জাদুকরী অবশেষ"। হারানো আর খুঁজে ফেরার পৌণপনিকতায় যা কিনা আজও অটুট।

# Music: A Reliable Cotherapist

**Chandana Aditya**
Assistant Professor, Psychology, Women's College, Calcutta

## Introduction

Art has different functions, ranging from producing pleasure and entertainment to new realisation of old experiences. Both creation and appreciation of art has an undeniable connection with human psyche. Sometimes it goes beyond the realm of conscious awareness of individual being. In Freud's (1917) words: "the artist loses in his daydreams, what is personal about him and makes it possible for others to save enjoyment, to derive consolation and alleviation from their own sources of pleasures in their unconscious".

Herbart Read (1972) advanced 'Einfuhlung' or empathy theory. It is the most accepted explanation for art appreciation. Here, observers 'project' themselves into the form of the work of art, and their feelings are determined by what they find there.

Other psychodynamic explanations refer to repression, an unconscious psychic force that operates within 'self' is "represented and expressed in art". This force is also active within the perceivers of art, shaping their 'conscious response' (Kuhns, 1983).

Music is a form of fine art which brings forth magical qualities of sound through skilful organisation of tones and pitches and touches every chord of human emotions. Music claimed as "the purest form and expression of art" (Coriat, 1945), does not

express a particular joy or sorrow but the moods "themselves in abstract", yet it enables us "to grasp and share them fully in their quintessence" (Schopenhaur in Crofton and Fraser, 1988). Music has healing properties and is considered as an allied healthcare profession. In essence, music can sway the human psyche, support, care and heal psychological ailment. It has stimulated behavioural researches which attempt to explore the effects of different aspects of music on and their interaction with the listener reactions.

This interdisciplinary field has generated diversified streams of researches, the significance of which consists of practical application of music as a therapeutic aid, with stressed person (e.g., Scartelli,1984), depressed persons (e.g., Shealy, Cady and Cox, 1995), psychotics (e.g., Lundin, 1985) and many others. A separate discipline of music therapy was present, perhaps from the dawn of cultures, though in a crude form only.

The second line of research is purely academic and instrumental, where all the variables related to music structure (e.g., Banavar and Kumar, 2001) listening situations (North and Hargreaves, 1997), listeners' gender (e.g., Tony and Weaver, 1994), expertise (Robazza, Macaluso and D'Urso, 1994) and personality (e.g., Payne, 1967; Rawlings, Hodge, Sherr and Dempsy, 1995; Stratton and Zalanowski, 1997) all are examined in an experimental set up.

**Music Therapy: Definition, Utility**

Music therapy is the clinical use of music to accomplish individualised goals such as reducing stress, improving mood and self-expression. Music therapy, an allied health profession, "is the clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individualised goals within a therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved music therapy program." Music therapy can be used as a solo standard treatment, as well as co-treatment with other disciplines, to address the needs in cognition, language, social integration, and psychological health and family support of an individual (Bronson et al., 2018). Additionally, music therapy has been used to improve various diseases in different research areas, such as rehabilitation, public health, clinical care, and psychology (Devlin et al., 2019). With neurorehabilitation, music therapy has been applied to increase motor activities in people with Parkinson's disease and other movement disorders (Bernatzky et al., 2004; Devlin et al., 2019).

**Techniques Used In Music Therapy**

Various techniques used in music therapy can be classified under two broad headings: Receptive Music Therapy and Active Music Therapy (also known as Expressive Music Therapy). Active music therapy engages clients or patients in the act of making music, whereas receptive music therapy guides patients or clients in listening or responding to live or recorded music (Grocke and Wigram, 2007).

**Music Therapy: East and West**

In UK and USA, the tradition of music therapy began as a part of treating war related emotional and physical trauma. Gradually the focus shifted to psychiatric patients. Positive changes in patients' mental and physical health were noted by nurses on administering music in psychiatric ward. The volunteer musicians, many of whom had degrees in music education, becoming aware of the powerful effects music could have on patients, realised that specialised training was necessary. In this way, the discipline of music therapy received an impetus (Knight, La Gassey and Clair, 2018; Davis and Gfeller, 2008). A review paper by Li, Weng and Wang (2021) highlighted the role of Improvisational Music Therapy (IMT) the current research frontier in the music therapy research field. Improvisational music-making may enhance social interaction and expression of emotions among children with autism,

such as responding to communication acts (Geretsegger et al., 2012, 2015). In addition, IMT is an evidence-based treatment approach that may be helpful for people who abuse drugs (Albornoz, 2011) or have cancer (Pothoulaki et al., 2012).

Unfortunately, there is no elaborate and systematic research using oriental music in clinical setting. There is an age-old claim that Indian Rāgas (the authentic form of Indian Classical Music) can alleviate physical and psychological suffering. Doctoral dissertation published by Aditya (2002) threw light on this rather obscured aspect of Indian classical music. That study used the technique of free association and qualitative method of phenomenological structuring. It established the fact that different rāgas can produce distinct emotional pattern within the listeners as claimed in traditional literature. Those rāgas also evoked a separate category of response pattern which fulfils the criteria of the construct 'catharsis' as found in literature. The difference in the pattern of emotional arousal and catharsis was found to be related with the personality traits of extraversion and introversion.

**Role of music in counselling**

It is already mentioned that music therapy can act in conjunction with other forms of traditional therapy like medicine, psychotherapy and counselling. Looking from both receptive and expressive aspects, music may aid to release tension, bring relaxation and facilitate communication in the counselling process.

Music is so effective for healing a soul because of its direct appeal to emotions. A tune which resonates properly with an individual's affect, may influence his physique and psyche for development of better coping skills.

Galimany (1993) said, "There is a particular sound for each individual... which guides his way of listening...". Searches should be directed to identify that 'note' which resonates the individual and take him to a pleasurable refuge, away from the daily humdrums of life.

**References**


Aditya, C. (2002) "Effect of Hindusthani Music (Instrumental) on the Emotional Arousal and Catharsis in Relation to Personality Dispositions" Doctoral Dissertation published under Calcutta University.

Albornoz, Y. (2011). The effects of group improvisational music therapy on depression in adolescents and adults with substance abuse: a randomised controlled trial. *Nord. J. Music Ther*. 20, 208-224. doi: 10.1080/08098131.2010.522717

American Music Therapy Association. About Music Therapy & AMTA. Retrieved January 2, 2021.

Banavar, G. and Kumar, S. (2001) *Emotions evoked by Indian Classical music*. Online newsletter, http://www.aoe.vt.edu/boppe/MUSIC/ART/emotion7html.

Bernatzky, G., Bernatzky, P., Hesse, H. P., Staffen, W., and Ladurner, G. (2004). 'Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with Morbus Parkinson'. *Neurosci. Lett.* 361, 4-8. doi: 10.1016/j.neulet.2003.12.022.

Bronson, H., Vaudreuil, R., and Bradt, J. (2018). 'Music therapy treatment of active duty military: an overview of intensive outpatient and longitudinal care programs'. *Music Ther. Perspect*. 36, 195-206. doi: 10.1093/mtp/miy006.

Coriat, I.H. (1945) "Some aspects of a psychoanalytic interpretation of Music." *Psychoanalytic Review*, Vol. XXXII (32) No. 1, pp. 408-18.

Davis, William B.; Gfeller, Kate E. (2008). "Music therapy: Historical perspective". In Davis,William B.; Gfeller, Kate E.; Thaut, Michael H. (eds.). *Music therapy: An introduction to theory and practice* (3rd ed.). Silver Spring, MD: The American Music Therapy Association. pp. 17-39. ISBN 978-1884914201.

Devlin, K., Alshaikh, J. T., and Pantelyat, A. (2019). Music therapy and musicbased interventions for movement disorders. *Curr. Neurol. Neurosci*. Rep. 19:83. doi: 10.1007/s11910-019-1005-0

Galimany, N.N.G. (1993) "Musical pleasure", International Journal of Psychoanalysis, 14, 383-391.

Geretsegger,M., Holck, U., Carpente, J. A., Elefant, C., Kim, J., and Gold, C. (2015). Common characteristics of improvisational approaches in music therapy for children with autism spectrum disorder: developing treatment

guidelines. *J. Music Ther*. 52, 258-281. doi: 10.1093/jmt/thv005

Geretsegger, M., Holck, U., and Gold, C. (2012). 'Randomised controlled trial of improvisational music therapy's effectiveness for children with autism spectrum disorders (TIME-A): study protocol. BMC Pediatr. 12:2. doi: 10.1186/1471-2431-12-2

Grocke, D.E.; Wigram, T. (2007). *Receptive Methods in Music Therapy: Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students*. Jessica Kingsley Publishers. ISBN 978-1-84310-413-1. Retrieved November 27, 2021. (https://books.google.com/books?id=EvAPBQAAQBAJ).

Knight, Andrew; LaGasse, Blythe; Clair, Alicia (2018). *Music therapy: An introduction to the profession*. Silver Spring, MD: The American Music Therapy Association. ISBN 978-1-884914-35-5.

Kuhns, R. (1983) *A Philosophy of Art on Developmental Principles*, New York : Columbia University Press.

Li K, Weng L and Wang X (2021) 'The State of Music Therapy Studies in the Past 20 Years: A Bibliometric Analysis'. *Front. Psychol.* 12:697726. doi: 10.3389/fpsyg.2021.697726.

Lundin, Robert, W. (1985) *An Objective Psychology of Music*. Malalear : Robert E. Krieger Publishing Company.

North, A.C. and Hargreaves, D.J. (1997). "Liking arousal potential and the emotions expressed by music." *Scandinavian Journal of Psychology*, 38, 45-53.

Payne, E. (1967) "Musical Taste and Personality". *British Journal of Psychology*, 58 (1 and 2), 133138.

Pothoulaki, M., MacDonald, R., and Flowers, P. (2012). 'An interpretative phenomenological analysis of an improvisational music therapy program for cancer patients'. *J. Music Ther.* 49, 45-67. doi: 10.1093/jmt/49.1.45.

Rawlings, D.; Hodge, M.; Sherr, D.; Dempsy, A. (1995) "Toughmindedness and preference for musical excerpts, categories and tried." *Psychology of Music*, 23 (1) 63-80.

Read, Herbert, *The meaning of art*, Faber and Faber Limited, London, 1972.

Robazza, C.; Macaluso, C.; D'urso, V., (1994) "Emotional reactions to music by gender, age and expertise," *Perceptual and Motor Skills*, 79, 939-944.

Schopenhaur, A. (1819) in Crofton, I; Fraser, D. (ed) (1985), *Dictionary of Musical Quotations* London: Routledge.

Shealy, C.N.; Cady, R.K.; Cox, R.H. (1995), "Pain, stress and depression: Psychoneurophysiology and therapy." *Stress Medicine,* 11 (2): 75-77.

Stratton, V.N. and Zalanowski, A.H. (1989) "The effects of music and paintings on mood." *Journal of Music Therapy*, 26, 30-41.

# Dance Movement Therapy

**Arunima Dutta**
PG Student (Bharatnatyam), Rabindra Bharati University

**Introduction:**

Dance is an art which helps humans to express their emotions through movements and gestures. Through choreography and facial expressions one can completely change oneself into another character. Dance is mostly associated with music; it creates body movements to rhythms. As dance is one of the primary form of art which has a long deep roots connected to human civilization, it carries different language, tradition and stories with it respective of the geographical location of the dance form. Apart from different region, religion, language of different dance forms, the basic of dance lies in expressing emotions and mood. Keeping in mind of this key factor dance/movement as active imagination was originated by Jung in 1916 developed in the 1960s by dance therapy pioneer Mary Whitehouse. Tina Keller-Jenny and other therapists started practicing the therapy in 1940.

Image source- *The Times of India*

**Dance Movement Therapy (DMT):**

Dance movement is an approach that helps clarify and release the stress, counter transference and burnout carried by both caregiver and the person in need of care. It mainly looks at the co-relation between movement and emotion. In the cut-throw world of professional dance and a desire to find a new use for the communicative and regenerative powers of dance. It is a therapy created by dancers, drawing on the field of dance, body movement sensory awareness, psychotherapy and group work. Through intuition and experience, dance and movement therapists have developed a huge space in the heart of people as human beings can bond together through rhythmical movement and expressions like joy, and dance is the fundamental about making those connections to self, to others to the world and beyond. It is a group or team work where each one has to let go of oneself gradually. In Dance Movement Therapy mental involvement is as important as physical involvement. The American Dance Therapy Association (ADTA) defines it as "the psychotherapeutic use of movement to promote emotional, social, cognitive, and physical integration of the individual, for the purpose of improving health and well-being" (ADTA, 2018).

**Personal Experience:**

In 2018, I have worked with a Kolkata based Dance Movement Therapy organization "SANVED" in collaboration with Anita R. Ratnam as part of my bachelors course at Presidency University. That was the first time I got exposed to the concept of DMT. As SANVED defines themselves "Kolkata Sanved's Dance Movement Therapy-for-Change model is unique, as it is practiced in the developmental context. Named Sampoornata [meaning: fulfilment], Kolkata Sanved's model was developed to heal and empower individuals from marginalized communities, including survivors of gender-based violence and at-risk children and youth." It was a week-long workshop, initially the focus was on creating bond between the troupe members by sharing their experience and getting to know each other. Engaging oneself mentally connected first and then moving towards movements. "Touch and Trust" are the salient features in this process. It starts with few movement games, for example, everyone was asked to stand in a circle and asked to tell one word which is very triggering to them, most of the words said by them were simple words like fire, dream, etc but the experience related to that word had a significant impact in each one's life. Other games were like walking in the space and making eye contact. Most of us did not know each other so initially it was hard to make eye contact. Once that round got over, the second round was to shake hands with each other. This process helped in building a connection with other another. DMT is also known as an approach as most of the process includes an approach for a cause. It engaged everyone so deeply that it can get a better understanding of oneself, their own view, self-question and have a clarity about the things one is doing and he/she wants. Choreography comes at last, in fact DMT does not have a strict rule for choreography. It is all about movement connected with the conscious which creates one's own movement which does not follow any choreographed pattern. It is all about learning, realizing and connecting every day.

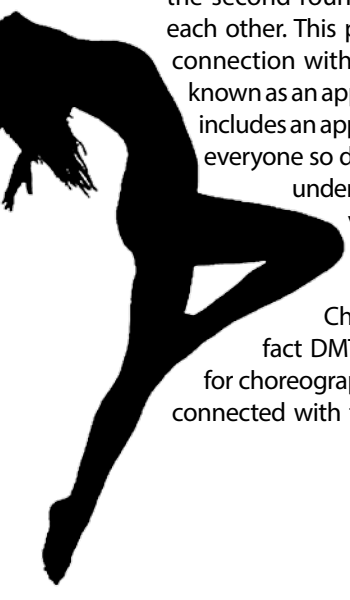

**Conclusion:**

DMT sessions are now organized by schools, Universities, offices as part of counseling. It is also considered an ice-breaker, in many public events art managers arrange DMT sessions for engaging public and to create dynamic relation among people. It also has other benefits like boosting self-esteem, physical, psychological, cognitive and social issues like: chronic pain, hypertension, cardiovascular diseases, anxiety, autism, trauma, etc.

**References**

Kaeppler, Adrienne L. "Dance Ethnology and the Anthropology of Dance." Dance Research Journal, vol. 32, no. 1, Congress on Research in Dance, 2000, pp. 116–25, https://doi.org/10.2307/1478285.

Kaeppler, Adrienne L. "Dance Ethnology and the Anthropology of Dance." Dance Research Journal 32, no. 1 (2000): 116–25. https://doi.org/10.2307/1478285.

Kaeppler, A. L. (2000). Dance Ethnology and the Anthropology of Dance. Dance Research Journal, 32(1), 116–125. https://doi.org/10.2307/1478285

Warburton, Edward C. "Of Meanings and Movements: Re-Languaging Embodiment in Dance Phenomenology and Cognition." Dance Research Journal 43, no. 2 (2011): 65–83. http://www.jstor.org/stable/23266966.

Warburton, Edward C. "Of Meanings and Movements: Re-Languaging Embodiment in Dance Phenomenology and Cognition." Dance Research Journal, vol. 43, no. 2, [Congress on Research in Dance, Cambridge University Press], 2011, pp. 65–83, http://www.jstor.org/stable/23266966.

Warburton, E. C. (2011). Of Meanings and Movements: Re-Languaging Embodiment in Dance Phenomenology and Cognition. Dance Research Journal, 43(2), 65–83. http://www.jstor.org/stable/23266966

https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_therapy

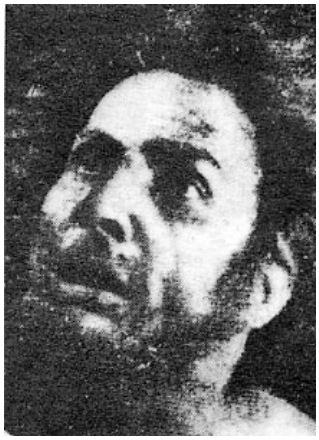

# বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সংগীতের ব্যবহার

**তনয়া আফরোজ**
**প্রাক্তন গবেষক, দি এশিয়াটিক সোসাইটি**

মধুসূদন থেকে শুরু করে বিজন ভট্টাচার্য সকল নাট্যকারই গানকে নাটকের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের পরবর্তী গান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি নাটকেই সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। তার 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকে সংগীতের বহুল ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'গদ্য সংলাপের সঙ্গে গান মিশে অনেক নাটকে প্রায় অপেরার মেজাজও তৈরি হয়। তবে এই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত গানেও নাট্যকারের অভিপ্রায়, জীবনজিজ্ঞাসা কোথাও পথভ্রষ্ট হয় না।'[১] রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে ইলার মুখে নাট্যকার পদাবলীর রাধিকার কথা বসিয়েছেন—

> আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
> তুমি অবসর—মতো বাসিয়ো।
> আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
> তোমার যখন মনে পড়ে আসোয়া।[২]

ইলার গান নাটকের ওপর সংগীতের খবরদারি নয়। বরং এই গানগুলি সাধারণ সংলাপ যা ধরতে পারে না, সেই অকথিত বাণীর সুর-রূপ। অথচ সংলাপের যা ধর্ম, পাত্রপাত্রীর হৃদয় উদ্ঘাটন, সেই ব্রতই এই গানগুলি পালন করেছে, অথচ সাধারণ সংলাপের অবয়ব গ্রহণ না করে বলা যেতে পারে এই গানগুলি সংলাপের অধিক।[৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সংগীতগুলি নাটকে সন্নিবেশিত হয়ে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকের সংগীত সংযোজনা সর্বোত্তম হয়েছে। বিশেষত ভিক্ষুক-বালার দুটি গান সবচেয়ে বেশি নাটকীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধ্বনী' ও পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে' দুটি গানই নাটকীয় পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেছে ও চাণক্য চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করেছে।[৪]

'নূরজাহান' (১৯০৮) নাটকের গানগুলিও অত্যন্ত মূনশিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। এখানে প্রেমের গান ও হাসির গান মূলত দু'ধরনের গানই ব্যবহার করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। চরিত্রগুলির হৃদয়-উদ্ঘাটন ও পরিবেশ সৃজনে গানগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান শরিক ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। নাটকের পাশাপাশি গান ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম হাতিয়ার। এই গানকে আশ্রয় করেই শোষিত বঞ্চিত সাধারণ জনগণের মধ্যে জনজাগরণেই উদ্বোধন ঘটানোই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যক্তি বিজন ভট্টাচার্য নিজেও ছিলেন একজন সংগীতপ্রেমী মানুষ। 'আবাল্য গ্রাম্য জীবন অতিবাহিত করার ফলে গ্রাম্য জীবনের সংগীতের প্রাণসম্পদ তার জানা ছিল। বাড়িতেও গানের চর্চা ছিল। পিতার কাছ থেকে তিনি সাহিত্য ও গানের তালিম নিয়েছিলেন।'[৫] সুতরাং তাঁর নাটকে সংগীতের ব্যবহার থাকবে এটা ভেবে নেওয়াই যায়।

'নবান্ন' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ফকিরের কণ্ঠে গীত গানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গানটি আকারে দীর্ঘ, দোহার সহাযোগে গীত। ত্রিশ পংক্তির

দীর্ঘ সংগীতের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের চরম দুর্দশার স্মৃতি কাহিনি আকারে মনে করিয়ে দিয়েছেন—

কালান্ত আকালে এমন কত চাষি ভাই।
আকালে য়ে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাচুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।
নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ বহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।।

এই গানটির মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষার কাজটি নাট্যকার খুব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। গানটিতে ধুয়াপদের মতো দুটি পংক্তি বারংবার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়ার বাণী প্রচারিত হয়েছে—

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষি দোস্তানি পাতান।।[৬]

সাম্প্রদায়িকতা ভুলে হিন্দু-মুসলিম জোটবদ্ধ হয়ে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইঙ্গিত আছে গানটিতে।

'জীয়নকন্যা' গীতনাট্যের প্রসঙ্গও এখানে স্বাভাবিকভাবে এসে যাবে। গান এখানে প্রাণদায়ী শক্তি। কথা ও সুরের মেলবন্ধন ঘটেছে গানটিতে। নাট্যকারের ভাষা—'এক একটা সুর দিয়ে ওরা প্রত্যেকটি মনের ভাবই প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ওদের রেনজ্ কম বলে, range of perceptionটা কম বলে ওদের অত vocabulary দরকার হয় না। সেটা পূরণ করে ওরা সুর দিয়ে... সুর এবং কথা দুটোই ইমর্পটান্ট। সুর ধরে কথা আসে, কথা ধরে সুর আসে, এদের সঙ্গে মিশে আমি এটাই দেখেছি।'[৭]

শোকবিহ্বল মাতা কলাবতীর হাহাকারের নিদারুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন নাট্যকার—

কলাবতী।।

কন্যা আমার চোখের মণি, কন্যা আমার আমার প্রাণ
বড়ো গলায় বলতাম তাই গঞ্জনা এমন।।
মাতা সে মরিয়া গেছে উলুপী জননী।
জীয়ন্ত আছে গো শুধু জননী প্রেতিনী।।[৮]

কলাবতীর হাহাকারে গোটা নন্দনপুরভ কথার সুরে শপথ নিয়েছে—

গ্রামবাসিনীগণ।।

(মাগো) জীয়াইব তোর সন্তানে
(মাগো) বাঁচাইব তোর সন্তানে
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
আমরা হলাম বেদের জাত মা
মহারণ্য মাঝে।
কালসর্প এমন নাই কোন
ওষুধ এড়ায় গিছে।।[৯]

বেদে বেদেনির সমবেত গানের একাধিক পরিচয় পাওয়া গেছে সমগ্র নাটক জুড়ে, এখানে একটি উদ্ধৃত করা হল—

দ্বিতীয় দল।।

হারে গো আয় কালনাগিনীর নাতিন জামাই...
এ দারুণ বিষের বিষম ভারান্।
জয় কালীর কিরে দে দ্যাও যে চালান।।
ওরে ডোরা কাটা লাল রক্ত-কানড়।
নীলনয়নী আয় লো পাথুরে-কানড়।।[১০]

এমনকি নাটকের একেবারে শেষে নাট্যকার সাপকে দিয়েও গান করিয়ে নিয়েছেন—

সর্প।।

দেশটি বেদের ছিল ভালো
এখন যেন কেমন হলো।
বিষম বাঁধন ছাড়ান পেলে
রাজ্য ছেড়ে যাবো চলে।
সুখের মুখে পড়ল ছাই
আমার কেনে মরণ নাই।[১১]

'গানে গানেই এই নাটকের শুরু, পরিণতি এবং সমাপ্তি। বিষয়ের সঙ্গে চমৎকার মিশে গিয়াছে গান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা বলে তার ভাষা অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে।'[১২]

মরাচাঁদ (১৯৪৮) নাটকেও নাট্যকার অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে গান ব্যবহার করেছেন। এ নাটকের প্রধান চরিত্র অন্ধ বাউল পবন বৈরাগী। গানই তার একমাত্র আশ্রয়, গানে গানে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। 'সংগীত প্রয়োগ এই নাটকে সংলাপের প্রতিটি অঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে আছে।'[১৩] সুন্দরী স্ত্রী রাধার প্রতি তার ভালোবাসা ভাষা পেয়েছে তার

গানে—

পবন।।

দিনের শোভা সবুজ রে
রাতের শোভা চাঁদ
আর চাষার শোভা হালকৃষি
জমিনের শোভা ধান
খঞ্জন পক্ষীর শোভা নাচে খঞ্জনী লইয়া
আর পুরুষের শোভা হইছে তার মতো সুন্দরী পাইয়া।[১৪]

অপরদিকে ভন্ড গোঁসাই কেতকাদাসের কণ্ঠে প্রেমের গভীরত্ব অপেক্ষা রাধার দৈহিক বর্ণনায় যেন মুখ্য হয়েছে—

কেতকাদাস।।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ।।
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।[১৫]

আবার পবন ও রাধার ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে ভাষা পেয়েছে তার গানে—

পবন।।

কালো মেঘে কৃষ্ণ চায়া
অম্বরে ডম্বরত বাজে।
অশনি করকাপাতে
বাজাও বাঁশী মোহনীয়া।।[১৬]

পবনকে ছেড়ে চলে যায় রাধা, থেমে যায় পবনের গান, —'মানুষটা যেন কেমন তারা হয়ে গেছে। কথা নেই, গান নেই! কথাই বলে না তার গান। একতারায় ধুলো পড়তেছে, ঘুণ ধরেছে বাঁশ কাঠিতি।'[১৭] পরে যদিও ডাকে ভাঙা গলায় গান গাইতে শোনা যায়। নতুন করে জাগার গান। নাট্যকার সুকৌশলে, এই জেগে ওঠার গানকে জনজাগরণের কাজে ব্যবহার করেছেন—

বাঁচব বাঁচব রে, আমরা বাঁচব রে বাঁচব
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাঙলা গড়ব
গোলায় গোলায় উঠবে ধান গলায় গলায় উঠবে গান
মায়ের বুকে শিশুর মুখে হাসির ঝলক আনব
নয়া বাঙলা গড়ব[১৮]

তীক্ষ্ণ সাংগীতিক অনুভূতিসম্পন্ন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে সংলাপ ও গানের মধ্যে মোটামুটি একই স্কেল বজায় রাখতে সচেষ্ট। মূলত তাঁর চরিত্র কথা বলতে বলতে অনায়াসে গান গাইতে পারে, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হয় না।

**সহায়ক তথ্যসূত্র**


১ সুনেত্রা ব্যনার্জী, বাংলা নাট্যসংলাপ ঃ ভাষাশৈলী, পৃ. ২০
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা ও রাণী (রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), ৫ম অঙ্ক/৪র্থ দৃশ্য, পৃ. ১৪৭
৩ অজিত কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, পৃ. ১২৫
৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাহিত্য সাধনা (দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ৭২
৫ দর্শন চৌধুরী, গণনাট্যের নবান্ন ঃ পুনর্মূল্যায়ণ, পৃ. ১১৩
৬ বিজন ভট্টাচার্য, (বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), ৪র্থ অঙ্ক/২য় দৃশ্য, পৃ. ১১০
৭ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা (বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ১৪
৮ বিজন ভট্টাচার্য, জীয়নকন্যা (বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ২০৮
৯ তদেব, পৃ. ২০৮-২০৯
১০ বিজন ভট্টাচার্য, জীয়নকন্যা (বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ২১৯
১১ তদেব, পৃ. ২৩৭
১২ নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সংগীতের ব্যবহার (জন্ম শতবর্ষে বিজন ভট্টাচার্য, নকুলচন্দ্র বাইন কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ২২
১৩ বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, বিজন ভট্টাচার্য নট নাট্যকার নির্দেশক, পৃ. ১৯৫
১৪ বিজন ভট্টাচার্য, মরাচাঁদ, একাঙ্ক (বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ১৯৩
১৫ তদেব, পূর্ণাঙ্গ, পৃ. ৪১৯
১৬ তদেব, পৃ. ৪৩২
১৭ তদেব, পৃ. ৪৩৯
১৮ তদেব, পৃ. ৪৪৪

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, *জলছবির রঙ*, আজকাল, ২০১৩ ।

জীবনের জলছবির এক প্রামাণ্য গ্রন্থ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের *জলছবির রঙ*। নির্মোহ ব্যক্তিত্বের এই আত্মকথন অতীব সুখপাঠ্য। ভাষামাধুর্য ও বর্ণনার মধ্যে এক দার্শনিক বিন্যাস রয়েছে। চুঁচুড়ার গঙ্গার বহমানতা তাঁর সঙ্গীত জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে; তাঁর কথায় "বহতানদীর খুব কাছে গিয়ে অনেকদিনের অনেক প্রহরে যাঁরা নদী দেখেননি, তাঁরা নদীর নিজস্ব গানের চলনটা ঠিক বুঝতে পারবেন না।.... নদীর স্রোতের খুব কাছাকাছি যেখানে সবুজ ঘাসের সতরঞ্চির প্রান্ত তার দুষ্টুমিতে বারবার ভিজিয়ে দিচ্ছে, সেটাই ছিল স্বঘোষিত প্রতিভাসন শিল্পীদের জলসা বসার স্থান।"

বালক জটিলেশ্বরের গানের প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ, কিন্তু গান শেখা বাড়ি থেকে হয়ে ওঠেনি। লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করার উৎসাহ মা, দাদারা দিয়েছেন পিতৃহারা জটিলেশ্বরকে। অকপট স্বীকারোক্তি, পরে যিনি বাংলা আধুনিক গানের সুবিদিত গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী হবেন, সেই জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের যে তিনি সব প্রথিতযশা শিল্পীদের গান নকল করে গাইতেন, হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন না। বাড়িতে গানের পরিবেশ ছিল যা দুরন্ত বালকের সব সাধ-স্বপ্নের স্বরলিপি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল। যাঁদের গান তিনি প্রাণভরে গাইতেন, তাঁরা সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন পাড়ার ফাংশানে তিনি গাইতেন আর তাঁর সঙ্গে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করতেন তাঁর দাদার বন্ধু খুদুদা। এইসময় হঠাৎই একদিন চুঁচুড়াতেই সতীনাথবাবুকে গান শোনাবার সুযোগ পান জটিলেশ্বর। সতীনাথবাবুর দূরদৃষ্টি ছিল। জটিলেশ্বরবাবুকে গান শেখাতে সম্মতি দেন। তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। বহুবছর তাঁর কাছেই জটিলেশ্বরের সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল। পঞ্চাশের দশক, বাংলা আধুনিক গানের সেরা সময়ের প্রবল উৎসাহী শিক্ষার্থী হলেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ ও তালিমের বর্ণনা ও গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বার বার তাঁর লেখায় এসেছে। তবে এক অনন্য অভিমান তাঁর ছিল যে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে কোন গান রেকর্ড করার সুযোগ তিনি পাননি। চিন্ময় লাহিড়ী ও সুধীন দাশগুপ্তের কাছেও জটিলেশ্বরের কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম। স্বতন্ত্রধারার সুররচয়িতা ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। যাঁর কাছে ক্লাসে বসে সঙ্গীত শিক্ষা না পেলেও গুরু বলে স্বীকার করতেন। বেসিক গান ও ফিল্মের গানের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক এই শিক্ষা তিনি সুধীনবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে।

পৃথিবীর এ এক অস্থির সময়। অচেনা মারণ ভাইরাস কেবল মানুষের প্রাণহানি করেনি, সামাজিক দূরত্বও তৈরি করেছে। অবসন্নতায় ভুগছে পৃথিবী। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। এর মধ্যেই লেগে গেল রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ। চারিদিকে মৃত্যুমিছিল। দীর্ঘশ্বাসে দিন শুরু করি, শেষও করি এক দীর্ঘায়িত নিঃশ্বাসেই। প্রতি ভোরেই আমার প্রথম মনে পড়ে "এ কোন সকাল/রাতের চেয়েও অন্ধকার"। শুনি। বার বার শুনি। ভাটিয়ার রাগ নির্ভর এই সুর এক অনবদ্য সৃষ্টি। বাণী ও সুর আজও প্রাসঙ্গিক, —"ভোরের পথের দিকে চেয়ে থাকা যায়/সে ভোর অন্ধ হল/কী হবে এখন?/তার যে কথা ছিল আলো দেবার।" সে গানই থেকে যায় যা সমকালীন ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রত্তোর যুগের গীতিকারেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় অনুসারিত। জটিলেশ্বরও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর গানের ভাব ও পেলব শব্দ নির্বাচন ও সুরের মাধুর্য মনের গভীরে প্রবেশ করে।

অমোঘ গতিময়তা আছে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গদ্যে। *জলছবির রঙ* কোন অতিরঞ্জিত আত্মজীবনীর উপাখ্যান নয় বরঞ্চ শৈশব থেকে ক্রমে শিল্পী হয়ে ওঠার অধ্যায়। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের রসবোধ অতীব উৎকর্ষ। ছোট ছোট বিশেষণ ও উক্তি গদ্যটির এক আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের যৌবনের বহু বন্ধুদের কথা জানা যায় এই বই থেকে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মৈত্র, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত চৌধুরী, অশোক রায়, মুকুল গুহ, আশিসতরু মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সান্নিধ্য পেয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অখিলবন্ধু ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, উৎপলা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো আরও বহু গুণীজনের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—"'প্ল্যাটিনাম কণ্ঠ' হেমন্তদার অসামান্য উপস্থাপনা, স্পষ্ট উচ্চারণ, আবেগের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ... একেবারে বিরল যোগ্যতার সহজ সম্মেলন ও একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিমিতিবোধ মিশে হেমন্তদার গানকে এত উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।" সলিল চৌধুরীর একদম ভিন্ন ধারার সুর, পর্দা নির্বাচন, অর্কেষ্টার ব্যবহার ও কোরাল অ্যাপ্রোচ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে মুগ্ধ করত। বাংলা গানে সলিল চৌধুরী নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এক জায়গায় লেখক বলছেন "একদা সলিলদাও পরোক্ষভাবে আমাকে গান লেখা ও সুর করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন।" জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় সহজ, স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও অমায়িক ছিলেন তা তাঁর বর্ণনা থেকে উঠে আসে। অন্য শিল্পীদের যথাযোগ্য সম্মান, প্রতিজনের গুণগান সদর্থে করেছেন। পঞ্চাশ দশক বাংলা আধুনিক গানের তারায় ভরা আকাশ, গীতিকার, সুরকার ও গায়কের এই রকম সমাগম আর হবে কিনা একসঙ্গে সে বিষয়ে হয়তো অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। প্রতিজন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গীমায় আমাদের মনে রয়েছেন।

সদাহাস্যময় খোলামনের মানুষ ছিলেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। যেসব শিল্পী তাঁর কাছে গান শিখেছেন বা সাহায্য নিতে গেছেন তিনি অকৃপণভাবে শিখিয়েছেন। যাঁরা সঙ্গীতপিপাসু ও সঙ্গীতচর্চা করেন এই তথ্য সমৃদ্ধ বইটি তাদের মন ছুঁয়ে যাবে এই আশা রাখি। শ্বাস নেওয়ার পদ্ধতি, স্বরক্ষেপণের কায়দা, উঁচু পর্দায় কণ্ঠের সংযম, সিঙ্গার্স সাইকোলজি, এসব নিয়েও গল্প বলার মতো বলেছেন। তাঁর বাক্যবিন্যাস, শব্দমালা জীবনের অধ্যায় যেভাবে সাজিয়েছেন, অধ্যায় নামকরণও এতটাই প্রাসঙ্গিক ও বাঙ্ময় যে বোঝা যায় তিনি খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন ও তাঁর লেখার ভাষা ও বিষয় শাণিত। প্রচুর পড়তেন। সেসবের উল্লেখ প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। গ্রন্থটিতে বহু অজানা তথ্যের সম্ভার রয়েছে। লতা মঙ্গেশকরের প্রথম বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে "কত নিশি গেছে নিদ্‌হারা ওগো/কত ফুল গেছে ঝরে" আর উল্টোপিঠে "আকাশপ্রদীপ জ্বলে/দূরের তারার পানে চেয়ে"; সলিল চৌধুরীর সুর ও কথায় জটিলেশ্বরের প্রথম দুটি গান "আমার এ জীবনে শুধু অন্ধ দুটি রাত/কোনও রাতে সূর্য ওঠে, কোনও রাতে চাঁদ"; আরেকটি "পাগল হাওয়া কি আমার মতন/তুমিও হারিয়ে গেলে"—এই দুটি গানের রেকর্ডিংয়ের দিনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল জটিলেশ্বরবাবুর। সলিল চৌধুরী আধখানি গানের সুর তাঁকে দিয়ে বললেন রেকর্ড শুরু করতে; এদিকে পুরো গানের সুর তখনও হয়ে ওঠেনি। শিল্পীর মনের মধ্যে চলছে তখন অন্তহীন দুশ্চিন্তা। যে গানের বাণী ও সুর সম্পূর্ণ নেই সেই গান কিভাবে তিনি গাইবেন! সলিল চৌধুরীর অভিনবত্ব সেখানেই ছিল, বিরতির সময় বাকি কথায় তিনি সুর করলেন। শিল্পীকে দিয়ে পুরো গানটির রেকর্ডিং সম্পন্ন করালেন। এসব নানা রঙের দিনের কথা, ঘটনা তাঁর গ্রন্থটিকে সজ্জিত করেছে।

শিল্পীর প্রাণে গান সবসময় বইত সেই, সেই ছেলেবেলা থেকে স্পর্শ পাওয়া চুঁচুড়ার গঙ্গার মত। বহু সুরকার ও গীতিকারের রচিত সঙ্গীতসাগরে তিনি ডুব দিয়ে অতলজলের তলা থেকে মুক্ত তুলে এনেছেন। ওনার শেখার আগ্রহ ও মুগ্ধতা তাঁর সঙ্গীত রচনার ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্ত, সলিল চৌধুরীকে অতি কাছে থেকে পেয়েও তিনি কিন্তু অনুকরণ করেননি।

গীতিকার অমিতাভ নাহা পরে যিনি জটিলেশ্বর

মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধী হয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জটিলেশ্বরের গান লেখার উদ্যোগ এনেছিল। অমিতাভ নাহার কথায় গীতা দত্তের গান "একটু চাওয়া, আর একটু পাওয়া", সুকুমার মিত্রের সুরে। তাঁর কথায় জটিলেশ্বরবাবুর অনেক গানের মধ্যে "হয়তো কোনদিন/বাতাস সারাদিন/মনের বনে ঝড় তুলবে"; "কখনও কখনও মাটির প্রদীপ সূর্য শক্তি পায়/তার সে আলো ছড়িয়ে পড়ে/ঘরের দেওয়াল তুচ্ছ করে/ওই আকাশ যে ভেসে যায়", —এরকম আরও কত গান। ১৯৬০ থেকে প্রায় ১৯৮০, —জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বাংলার সুরের আকাশে যেন ধ্রুবতারা। গীতিকার ও সুরকার জটিলেশ্বরের যুগত্তোর সেইসব গানগুলি, —"ফুলরাখি খুলে রেখ না/না শুকালে শুকাবে/যায় ঝরে যাবে/তুমি না হয় চেয়ে দেখো না"; "আমি ফুলকে যেদিন ধরে বেঁধে" "এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার"; "কেউ বলে ফাল্গুন কেউ বলে পলাশের মাস"; "বধুয়া আমার চোখে জল এনেছে হায় বিনা কারণে"; কিংবা সত্তর দশকের নিদারুণ সময়ের সেই বিখ্যাত গান "আমার স্বপন কিনতে পারে এমন আমীর কই/আমার জলছবিতে রঙ মেলাবে/এমন আবীর কই"—সেইসব কালজয়ী গান। জটিলেশ্বর কিন্তু গানকে চিন্তা ও দর্শনের চরিত্রে অসম্পূর্ণ রাখেননি। সুর নির্মাণের সময় কিছু ভাবনা আচম্বিতে এসে পড়ে, চেষ্টা ও সচেতনতায় শব্দ ব্যবহারের পর গানে প্রাণ আসে। কখনও সুরের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে বদলেছেন শব্দ।

অনেক কবিতার সুর করেছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অপরাজিতা' কবিতা "পরাজিতা তুই সকল ফুলের কাছে/তবু কেন তোর অপরাজিতা নাম?"; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত"; "অন্ধকার পেরিয়ে যাই ('পারুল বোন')"; "ও ছাদ ও ছাদ/আমার কন্যে পুপের জন্য/বেঁধে আন তো চাঁদ"; এছাড়াও জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও সুর দিয়েছেন জটিলেশ্বর। বহুগুণী শিল্পীর নাম, সুরস্রষ্টা ও গীতিকারের কথা উঠে এসেছে এই বইতে যা আমাদের ঋদ্ধ করেছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সুর দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছড়া—"ছিপখান তিন দাঁড়"; প্রেমেন্দ্র মিত্রের "শূণ্যের আনমনা হাসির সামিল/ওড়ে শুধু কটা গাঙচিল"; সুধীন দাশগুপ্তের সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নীল নীল সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝি না"—যুব উৎসবে গাওয়া হয়েছিল। কিছু কিছু কবিতা যেন সুরের আশায় বসে থাকে। সলিল চৌধুরী মাইকেল মধুসূদনের কবিতাতে সুর দিয়েছিলেন। সব সুর হয়তো 'গান' হয়ে উঠতে পারেনি তবে আমাদের অজানা বহু গানের ইতিহাস তাঁর লেখা থেকে জানা গেল। কবিতাই যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আধুনিক বাংলা গানের কথার চেহারা বদলে দিয়েছে এটা জটিলেশ্বর বিশ্বাস করতেন। উনি বলেছেন এক জায়গায় যে, কবি ও সাহিত্যিকরা যদি আরও গান লিখতেন বাংলা আধুনিক গান আরও সমৃদ্ধ হত।

*জলছবির রঙ* বালক থেকে বাংলা আধুনিক গানের একটি বিশেষ অধ্যায় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় হয়ে ওঠার আখ্যান। প্রথম জীবনে কিছুদিন রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডুকেশন ডাইরেক্টরেটে চাকরি করেছেন। কিন্তু মনের মধ্যে সবসময় সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গার মতো গানের ধারা বয়ে গেছে। বিষাদের সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড়তর যোগাযোগ থাকলেও ব্যক্তিগত দুঃখ কখনোও তাঁর গান রচনা ও সুর দেওয়ায় অন্তরায় হয়নি।

**সুরঞ্জনা চৌধুরী**
**প্রকাশনা বিভাগ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি**

# Manuscripts on Saṁgītaśāstra in the Collection of the Asiatic Society Museum, Kolkata

**Keka Adhikari Banerjee**
Curator, The Asiatic Society

The Asiatic Society, Kolkata possesses some valuable treasures of manuscripts on music, revealing the age-old Indian culture in the field of performing arts. Albeit a few, this collection grouped as *Saṁgītaśāstra* is unique in nature as they source the origin and practice of classical music in India. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society by MM Haraprasad Shastri, revised and edited by Chintaharan Chakravarti (vol. XIV) informs that Mr. O.C. Gangoly, an expert in the field of classical music has demonstrated in his *Rāgas and Rāginī*s (Calcutta, 1948) that some unpublished manuscripts on *Saṁgītaśāstra* are in the possession of the Asiatic Society which portray some special attention. Beside this, reference of a great patron of Indian music and literature - Malik Suluta Śāhi or Malik Sarak Sulitan Śāhi of Kaḍā, near Veṇī is worth mentioning. This music lover collected various Sanskrit works on music and assembled scholars from different parts of the country. Manuscripts like *Ānandasañjivana* contains *Vādyādhyāya, Rāgadhyāya*, and the manuscript *Saṁgitapārijāta* informs about *Vādya* and *Tāla* which have special value in the field of research on music.

There are references of other patrons in a number of works like Jayachandradeva Saptamacakravarti - patron of Kavibālasarasvatī Subhaṁkara, author of *Saṁgānasāgara,* Gajapati Nārāyaṇadeva, son of Padmanābha - patron of Puruṣottama Miśra, author of *Samgitanarayana.* In 1428 A.D., this band of scholars composed the *Saṁgītaśiromaṇi* at the bidding of the Śāhi.

A List of Manuscripts on *Saṁgītaśāstra* in the Collection of the Museum of The Asiatic Society

| Sl. No. | Accession No. | Name of the Manuscript | Author / Commentator | Folio | Complete / Incomplete | Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G-1781 | *Saṁgītaratnākara* | Śārṅgadeva | 19 | Incomplete | | Language-SanskritScript – Nāgara4th Chapter only |
| 2 | G-9051 | | | 40 | | | 5th Chapter only |
| 3. | G-1131 | | | 06 | | | |
| 4. | G-3821 | | | 114 | | L.S.362 | 7th Chapter only. |
| 5. | G-1110 | Commentary on *Saṁgītaratnākara* | Kallinātha | 1-46 & 38-72 | Incomplete | - | - |
| 6. | G-4183 | *Sadrāgacandrodaya* | Pundarika Vitthala | 14 | Incomplete | | Language-SanskritScript – NāgaraThe manuscript gives illustrations of what are called *Vīnās*. |
| 7. | G-5040 | *Pañcamasaṃhitā* | Nārada | 5 | Incomplete | | 3rd Chapter only, it deals with *Rāgas* and *Rāginīs* |
| 8. | G-8365 | *Ānandasañjivana* | Madanapāla | 40 | Incomplete | | This manuscript contains portions of *Pravandhyāyaya*, *Vādyadhyāya*, *Rāgadhyāya*. |
| 9. | G-9054 | *Saṁgitapārijāta* | Ahobala | 31 | Incomplete | | It deals with the *Rāgaprakaraṇa*. |
| 10. | G-1129 | | | 35 | | | |
| 11. | G-1196 | | | 22 | | | |
| 12. | G-1713 | *Saṁgītaśiromaṇi* | Sulutaśāhi | 2-26 | Incomplete | | It deals with different topics of the science of music. |

| Sl. No. | Accession No. | Name of the Manuscript | Author / Commentator | Folio | Complete / Incomplete | Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | G-2513 | *Samgitanarayana* | Puruṣottama Miśra | 69 | Complete 4 Chapters | | |
| 14. | G-4852 | *Samganasagara* | Subhaṁkara | 47 + 28 | Incomplete | | Language-SanskritScript-Newāri.This deals with vocal and instrumental music. |
| 15. | G-1195 | *Rāgamālā* | Kṣemakarṇa | 15 | Complete | Samvat 1833 | The manuscript contains 134 verses with different topics of Ragas. |
| 16. | G-10243 | *Rāgamālā* | Kṣemakarṇa | 25 | Incomplete | - | Language-SanskritScript-Nāgara |
| 17. | G-8321 | *Rāgavibodha* | Soma | 15 | Incomplete | - | Language-SanskritScript-Nāgara |
| 18. | G-10245 | *Rāgaratna* | Māṇikya | 4 | Incomplete | Samvat 1888 | Language-SanskritScript-Nāgara |
| 19. | G-10615 | *Saṁgītacintāmaṇi* | Anonymous | 1-2 & 1-3 | Incomplete | - | Language-SanskritScript-NāgaraThis deals with the origin of the Ragas. |
| 20 | G-10144 | *Saṁgītakautuka* | | 8 | Incomplete | | Language-SanskritScript-Nāgara |
| 21 | G-1139 | *Sankirṇarāgalakṣaṇa* | | 6 | Complete | Samvat 1798 | It deals with the *Rāgalakṣaṇa* |
| 22 | G- 8316 | *Gānaśāstra* | | 9 | Complete(?) | | Language-SanskritScript-Nāgara |

# Books Accessioned during the Last Month

**954.042**
**L892c**
Louro, Michele L., 1977-
Comrades against imperialism:Nehru, India, and interwar internationalism /Michele L. Louro. - United Kingdom: Cambridge University Press,2018.
xvi, 309p.; 24cm. **(78618)**
Index: p. 299-309 Bibliography: p. 284-298.
ISBN : 978-1-108-41930-7 (hbk) : £ 75.00.
1. Nehru, Jawaharlal, 1889-1964 2. Anti-imperialist movements 3. Internationalism 4. Diplomatic relations. I. Title

**RR 954.03**
**V287c**
Varadpande, M.L.
Concise dictionary of Indian culture:M.L. Varadpande. - Gurgaon, India: Shubhi Publications,2018.
157p.: ill. (col.); 30cm. **(77974)**
ISBN : 978-81-8290-471-2 : Rs. 1995.00.
1. Culture - India - Dictionary 2. Indian History - Culture- Dictionary. I. Title

**069.53**
**S617ca**
Singh, A.P.
Conservation and museum techniques:by Dr. A.P. Singh. - Delhi: Agam Kala Prakashan,2019.
xi, 129p., txiiidp. of pls.: ill.; 24cm. **(77983)**
Include references and indexes References: p. 123-124. - Index: p.125-129.
ISBN : 978-81-7320-189-9 : Rs. 110.00.
1. Museum - Conservation - Techniques. I. Title

**808.882**
**P641c**
Pillai, Manu S., 1990-
The courtesan, the mahatma & the Italian brahmin:Manu S. Pillai; illustrations by Priya Kuriyan. - Chennai: Context an imprint of Westland Publications Private Ltd.,2019.
384p.: ill.; 23cm. **(78619)**
ISBN : 9789388689786 : Rs. 599.00.
1. Anecdotes. I. Kuriyan, Priya, ill. II. Title

**304.2095**
**C969c**
Cultural landscapes of Asia:understanding and managing heritage values / edited by Moe Chiba, Shikha Jain, Sonali Ghosh and V.B. Mathur. - New Delhi: Aryan Books International,2018.
iv, 205p.: ill.; 29cm. **(77979)**
ISBN : 978-81-7305-600-0 : Rs. 2800.00.
1. Cultural landscapes - Asia. I. Chiba, Moe, ed. II. Jain, Shikha, ed. III. Ghosh, Sonali, ed. IV. Mathur, V.B., ed. V. Title

**S**
**491.25**
**D575d**
Dikshit, Pushpa
Dhatvadhikariyam samanyamangakaryam = धात्वधिकारियम समान्यमंगकार्यं:Pushpa Dikshit; edited by Abhijit Dikshit. - Delhi: Jnana Bharati Publications,2017.
xvii, 279p.; 25cm. **(S7095)**
ISBN : 978-93-85538-07-0 : Rs. 2500.00.
1. Sanskrit Language - Grammar. I. Dikshit, Abhijit, ed. II. Title

**RR 192.03**
**D554b**
The dictionary of twentieth-century British philosophers : general editor : Stuart Brown.
- England: Thoemmes Continuum,2005.
xxx, 594p.; 24cm. **(78064)**
Vol.1: A-L. - Vol.2: M-Z.
ISBN : 1-84371-096-X : Rs. 450.00 (Set of 2vols.).
1. Philosophers - Dictionary 2. Philosophy, British 3. Great Britain. I. Brown, Stuart, ed. 1938- II. Title

**776**
**H791da**
Hope, Cat
Digital arts:an introduction to new media /Cat Hope and John Ryan. - New Delhi: Bloomsbury,2014.
viii, 271p.: ill.; 23cm. **(78620)**
First published in India 2019 Bibliography: p. 231-246 Index: p. 247-271.
ISBN : 978-93-88912-28-0 : Rs. 999.00.
1. Digital media 2. Technology and the arts 3. New media art. I. Ryan, John, jt.auth. II. Title

**934**
**D767m**
Draupadi and her pancala: re-asserting their place in history /
edited by Neera Misra and Rajesh Lal. - Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2018.
xviii, 184p., ţ23p.ḍ of pls.; 29cm. **(78016)**
Three papers in Hindi Papers presented at Panel Discussion on Revisiting Draupadi and at the seminar on Significance of Pancala, organised by Draupadi Dream Trust via the Pancala Mahotsava, New Delhi in December 2013 Includes bibliographical references.
ISBN : 9789387587335 : Rs. 2250.00.
1. Draupadi 2. Pancala (India) - Antiquities - Congresses. I. Misra, Neera, ed. II. Lal, Rajesh, jt.ed. III. Title

**370.10954**
**T128e**
Education as freedom:
Tagore's paradigm /translated by Subhransu Maitra. - New Delhi: Niyogi Books,2014.
320p.; 24cm. **(78088)**
Index: p. 314-320.
ISBN : 978-93-83098-22-4 : Rs. 695.00.
1. Tagore, Rabindranath, 1861-1941 2. Education - India. I. Maitra, Subhransu, tr. II. Title

**722.44**
**R177e**
Ram Raz, 1790-1830
Essay on the architecture of the hindus:Ram Raz. - Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2018.
xiv, 64p., ţxlviiḍp. of pls.: maps; 29cm. **(77980)**
Reprint. Originally published: London: published for the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, by John William Parker, 1834 "With forty-eight plates".
ISBN : 9789387587175 : Rs. 950.00.
1. Hindu architecture - India 2. Hindu temples - India 3. Architecture of the Hindus. I. Title

**930.1092**
**F314m**
Felicitating a legendary archaeologist Prof. B.B. Lal:
edited by B.R. Mani, Rajesh Lal, Neera Misra and Vinay Kumar. - Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2018.
3v.: ill. (col.); 29cm. **(78037)**
One chapter in Hindi Includes bibliographical references.
ISBN : 978387587458 (Set of 3vols.) : Rs. 7500.00 (Set of 3 vols.).
1. Lal, B.B.(Braj Basi), 1921 - honouree 2. Archaeologists - Biography 3. Antiquities 4. India - Antiquities. I. Mani, B.R., ed. II. Lal, Rajesh, ed. III. Misra, Neera, ed. IV. Kumar, Vinay, ed. V. Title

**20.550954**
**K19g**
Kashyap, Naresh 3
Gandhi and grant:their philosophical affinities /Naresh Kashyap. - New Delhi: Arise Publishers & Distributors,2012.
280p.; 22cm. **(78107)**
Bibliography: p. 275-276 Index: p. 277-280.
ISBN : 978-93-81031-18-6 : Rs. 950.00.
1. Grant, George Parkin, 1918-1988 2. Gandhi, Mahatma, 1869-1948 3. Nationalism - Philosophy 4. Economic Philosophy - Gandhi. I. Title

**305.42**
**G325c**
Gender and development:the economic basis of women's power /
edited by Samuel Cohn and Rae Lesser Blumberg. - Los Angeles: Sage Publications, Inc.,c2020.
xii, 285p.; 26cm. **(78627)**
Includes bibliographical references and index.
ISBN : 978-1-5063-9663-7 : ś 59.00.
1. Women in development 2. Women - Economic conditions. I. Cohn, Samuel, ed. II. Blumberg, Rae Lesser, ed. III. Title

**704.948945**
**M214g**
Mahapatra, Sanjaya Kumar, 1963-
Goddess Varahi in Indian art:Sanjaya Kumar Mahapatra. - Delhi: B.R. Publishing Corporation,2018.
xviii, 114p., ţ32ḍp. of pls.: maps; 28cm. **(77982)**
Includes bibliographical references and index Bibliography: p.81-98. - Index: p.99-104.
ISBN : 9789387587113 : Rs. 1750.00.
1. Varahi (Hindu deity) - Art 2. Shaktism in art 3. Art, Indic 4. Art, Oriya. I. Title

**934.03**
**A769g**
Arora, Udai Prakash
Greek sources of India: Alexander to Megasthenes / Udai Prakash Arora. - New Delhi: Aryan Books International,2018.
xxvi, 500p., ţ50p.ḍ of pls.; 25cm. **(78009)**
Includes bibliographies and index.
ISBN : 978-81-7305-601-7 : Rs. 3600.00.
1. Greek Sources - India 2. ALEXANDER, THE GREAT, 356 B.C.-323 B.C. 3. History - Sources 4. Historiography. I. Title

**362.10954**
**H434n**
Healers or predators? : healthcare corruption in India /
edited by Samiran Nundy, Keshav Desiraju and Sanjay Nagral. - New Delhi: Oxford University Press,2018.
xxviii, 657p.; 23cm. **(78057)**
ISBN : 9780199489541 : Rs. 750.00.
1. Medical care - Corrupt practices 2. Medical ethics 3. Medical policy - India. I. Nundy, Samiran, ed. II. Desiraju, Keshav, ed. III. Nagral, Sanjay IV. Title

**333.95160954**
**H548t**
Heritage and environment of coastal regions:a case for conservation /
edited by Rajeshwari Tandon. - New Delhi: INTACH (The Indian National Trust for Art and Cultural Heritage),2018.
x, 178p.; 23cm. **(77977)**
Annexure I to Annexure IV: p.153-178.
ISBN : 978-81-7305-609-3 : Rs. 995.00.
1. Historic Sites - India 2. Cultural Property - India 3. Heritage - Conservation. I. Tandon, Rajeshwari, ed. II. Title

**363.69**
**H548t**
Heritage conservation and management:a case for national policy /
edited by Rajeshwari Tandon. - New Delhi: INTACH (The Indian National Trust for Art and Cultural Heritage),2018.
xvii, 236p.: ill.; 23cm. **(78019)**
Includes annexure.
ISBN : 978-81-7305-610-9 : Rs. 1500.00.
1. Cultural Property - Protection 2. Historic Preservation 3. Historic sites - Conservation and Restoration. I. Tandon, Rajeshwari II. Title

**294.5921**
**H662hs**
Hindu scriptures:hymns from the Rigveda, five upanishads, the Bhagavadgita /
edited by Nicol Macnicol; foreword by Rabindranath Tagore. - New Delhi: Cosmo Publications,2003.
xxiv, 293p.; 23cm. **(78166)**
ISBN : 81-7755-748-3 : Rs. 500.00.
1. Hinduism 2. Brahmanism. I. Macnicol, Nicol, 1870-1952, ed. II. Title

**959.602**
**S131h**
Sahai, Sachchidanand
Hindu temples lost in the forest:rediscovering the world heritage site of Ishanapura-Sambor Prei Kuk /

Sachchidanand Sahai. - Delhi: B.R. Publishing Corporation,2018.

xxii, 382p., ţ266p.ḍ of pls.; 29cm. **(78026)**

Includes bibliographical references.

ISBN : 9789387587304 : Rs. 5000.00.

1. Lost architecture - Cambodia - Kampong Thun (Province) 2. World Heritage areas - Cambodia - Kampong Thun (Province) 3. Hindu temples - Cambodia - Kampong Thun (Province). I. Title

**954**
**H673m**

History and society: proceedings of the fourth state conference of bharatiya itihas sankalan samiti, Odisha /

edited by Baba Mishra and Priya Sasidharan. - Delhi: Bharatiya Itihas Sankalan Samiti & B.R. Publishing Corporation,2018.

xx, 147p., ţcol. p.ḍ of pls.; 29cm. **(78034)**

Includes bibliographical references.

ISBN : 9789387587212 : Rs. 2000.00.

1. Odhisha (India) - History - Antiquities. I. Sasidharan, Priya, ed. II. Mishra, Baba, ed. III. Title

**726.145095484**
**B185h**

Balgoori, Raju

History, art and architecture of the temples: Karimnagar district, Telangana /Raju Balgoori. - Delhi: B.R. Publishing Corporation,2018.

vii, 220p.: ill. (col.); 29cm. **(78027)**

Originally presented as the author's thesis (Ph.D.)-Kakatiya University, 2014 Includes bibliographical references.

ISBN : 9789387587434 : Rs. 3500.00.

1. Hindu temples - India - Karimnagar (District) - History 2. Architecture, Chalukyan - India 3. Sculpture, Chalukyan - India 4. Karimnagar - Antiquities. I. Title

## JUST RELEASED

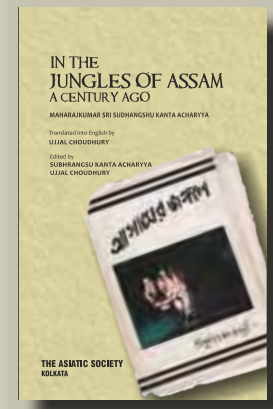


Demy 8vo | xvi+252 pages | ₹ 500

*This is an English translation of a book originally written in Bengali in the early thirties by Maharajkumar Sudhangsu Kanta Acharyya, scion of the Acharyya Choudhury family of Mymensingh. The book, based primarily on his experiences of shikar in the Darrang district of Assam in undivided India, also introduces the reader to various folklores and social events, weaving together diverse human perspectives and philosophies. This very rare book has been resurrected with added value, under the aegis of the Asiatic Society, to reach a wider audience of contemporary times.*

*The present version has been enhanced by an add-on section containing narratives that dovetail with some of the original stories, based on inputs from the author's son Dr. Subhrangsu Kanta Acharyya. Apart from select pictures from the original book, it contains rare and interesting pictures curated by Dr. Acharyya from various personal collections. These greatly add to the old-world charm of the book.*

# Our latest arrival

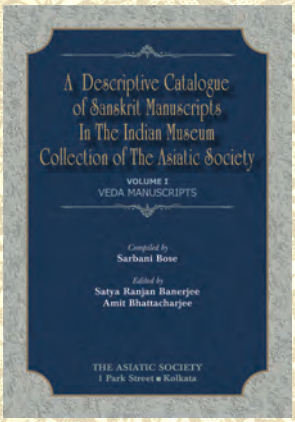

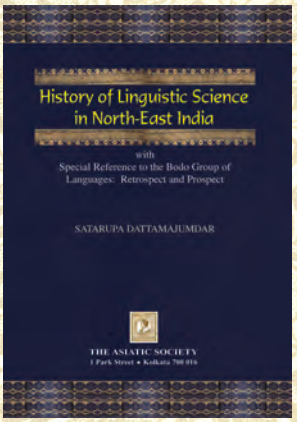


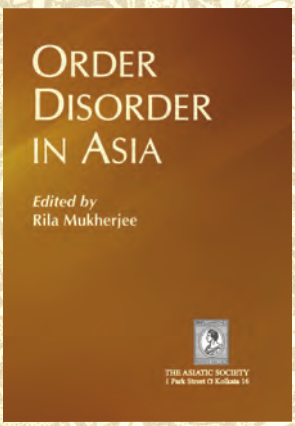


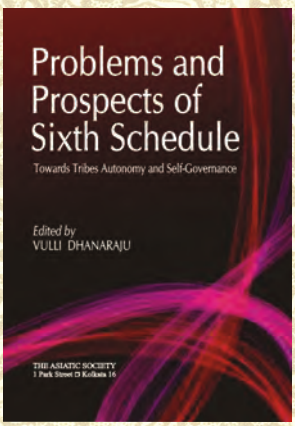


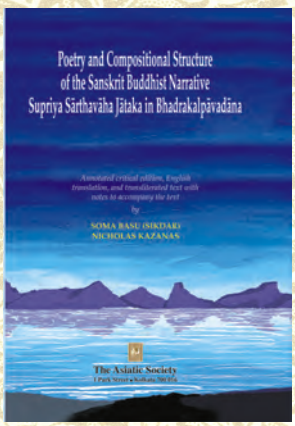


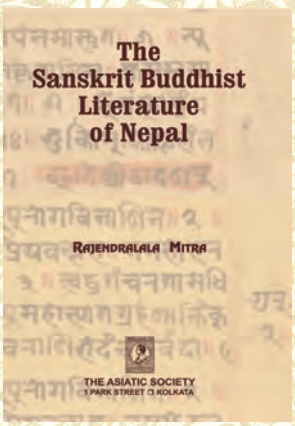

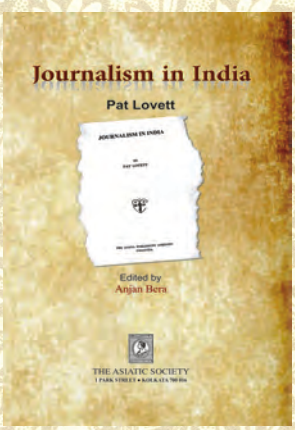

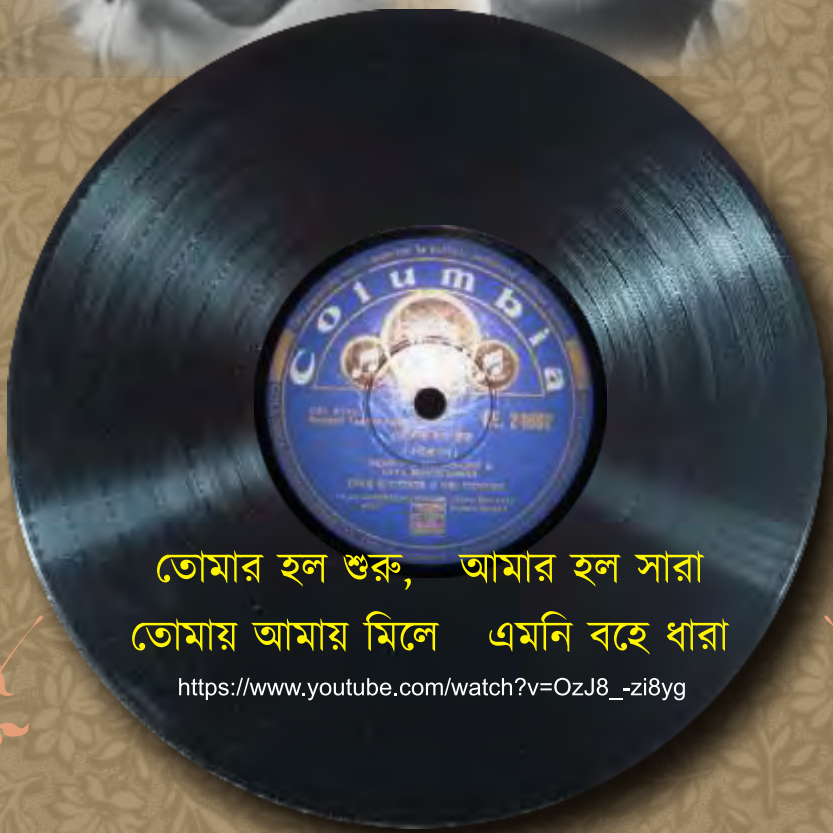

**Tomar Holo Shuru (1953)**

Lata Mangeskar with Hemanta Mukherjee

Lyric : Rabindranath Tagore

Music : Rabindranath Tagore

GE 24692; *SEDE 3001; *ECLP 2552; *SURL 501

Published by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : gs.asiatic@gmail.com
Web: www.asiaticsocietykolkata.org
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com